নভেম্বর ২০২৪ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩১

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

হেমন্তে বাংলার রূপ

আয়েশা লুবাবা, চতুর্থ শ্রেণি, টি অ্যান্ড টি হাই স্কুল, মগবাজার, ঢাকা

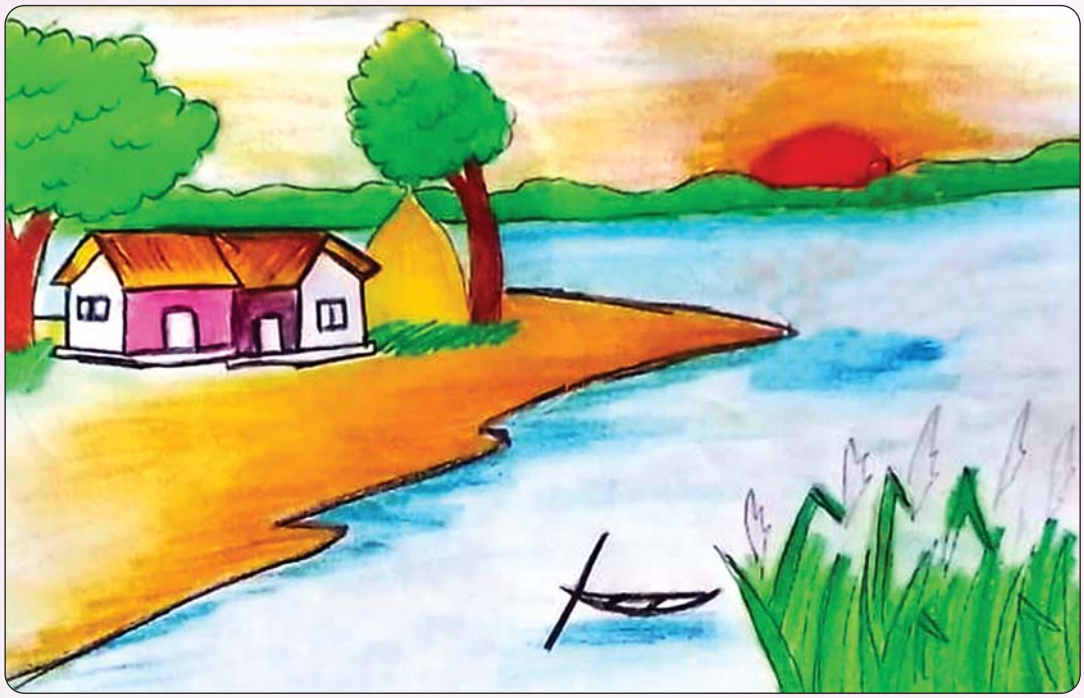

ইয়াছিন আরাফাত সায়েম, ষষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

সম্পাদকীয়

কার্তিক-অগ্রহায়ণ এ দুইমাস হেমন্ত কাল। এক অপরূপ রূপের ঋতু হেমন্ত। মাঠের পাকা সোনালি ধান, সেই ধান ঘরে তোলার দৃশ্য, কৃষান-কৃষানির আনন্দ সবই হেমন্তের রূপের অনুষঙ্গ। নবান্ন মানেই নতুন অন্ন বা নতুন খাবার। এই ধান কাটাকে কেন্দ্র করে নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। এ উৎসবে বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পায়েস, প্রভৃতি সুস্বাদু খাবার তৈরি হয় এবং স্বজন-পড়শিদের ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। খাওয়াদাওয়া ছাড়াও চলে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হেমন্ত নাতিশীতোষ্ণ ঋতু শুরুর দিকে এক অনুভূতি, আর শেষ হেমন্তে অন্য অনুভূতি।

হেমন্ত এলে খালেবিলে পানি কমতে থাকে। ধরা পড়ে কই, শিং, মাগুর, শোল ও টাকির মতো দেশি মাছ। তখন গ্রামের ছোটো বড়ো সবাই মেতে উঠে মাছ ধরা উৎসবে। এ সময় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসতে থাকে অতিথি পাখি। তারা আমাদের মেহমান। বিভিন্ন দেশের ভালোবাসার সেতুবন্ধন তৈরি করে।

সকালের শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রস্তুত হয় হেমন্তের প্রকৃতি। কাননে কাননে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেবকাঞ্চন, রাজঅশোক, ছাতিম, বকফুল আরও অনেক ফুল।

ভালো থেকো, নবারুণের সাথে থেকো।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৭০২

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

সিনিয়র সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহসম্পাদক
তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
মেজবাউল হক

সহযোগী
শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

সম্পাদকীয় সহযোগী
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৪ হেমন্তে বাংলার রূপ/ শারমিন নাহার ঝর্ণা
০৭ হেমন্তের ফুল/ মো. ইকবাল হোসেন
৫৪ শিশির কেন পড়ে/ আতিক রহমান
৫৭ অতিথি পাখি রহস্য/ কাকলী মজমুদার
৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

১১ হযরত চাচার প্রতিদিন/ শিবশঙ্কর পাল
১৫ পাখির বাসা/ রফিকুর রশীদ
১৯ বনের রাজা ও ডাক্তার/ আবদুল লতিফ
২২ নাম তার লালি/ আঞ্জুমন আরা
২৫ ব্যাঙ ও পুঁটি/ মুহাম্মদ নূর ইসলাম
২৭ হাতি ও সিংহ/ কামরুল হাছান মাসুক
২৯ জাদুর কলম/ মিলাদ হোসেন সুজন
৩১ গরম পিঠা/ আল আমিন মুহাম্মাদ
৩৩ অবুঝ মেয়ে/ ইজামুল হক
৪০ পরি/ তাহমিদ হাসান
৪৬ অপারেশন থ্রি হিরোস/ শাকিব হুসাইন
৫১ মামা ও শিকারি/ ইকবাল কবীর রনজু

প্রতিবেদন

৪৫ নবান্নের পিঠা পায়েস/ মেজবাউল হক
৫৬ প্রথম রেলওয়ে স্টেশন/ শাহানা আফরোজ
৫৯ হাঁটলে কমবে বিষণ্নতা/ তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা
৬০ দ্য ভেজিটেরিয়ান জয় করল নোবেল/ জান্নাতে রোজী
৬১ ঋতু অনুযায়ী শিশুর যত্ন/ মো. জামাল উদ্দিন
৬২ স্থাপত্যশৈলীতে আন্তর্জাতিক পুরস্কার
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কবিতাগুচ্ছ

০৩ সুফিয়া কামাল
৯ গাজী আরিফ মান্নান/ সাজ্জাদ হোসেন লিখন
১০ আনোয়ার হোসেন প্রধানীয়া/ মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ
১৪ আব্দুস সাত্তার সুমন

ছোটোদের ছড়া

১৮ সাকিবুল ইসলাম/ মৌমিতা আহমেদ মৌমি/ সোহেল আশরাফ সিদ্দিকী
২১ সাবিনা মাহবুব

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : আয়েশা লুবাবা
ইয়াছিন আরাফাত সায়েম
তৃতীয় প্রচ্ছদ : মো. তাহসিন ইসলাম রুহি
শারিকা তাসনিম
শেষ প্রচ্ছদ : তামাজুর জামান গল্প
৩২ জুলকারনাইন প্রাচুর্য
৩৯ ফাহমিদা নবী প্রভা
৬৪ মো. ইয়াকুব বর্ণ

নবারুণ পত্রিকা পড়া ও ডাউনলোড করা যাবে
Nobarun Potrika
www.dfp.gov.bd

হেমন্ত

সুফিয়া কামাল

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন্ পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?

আনল ডেকে মটরশুঁটি,
খেসারি আর কলাই ফুলে
আনল ডেকে কুয়াশাকে
সাঁঝ সকালে নদীর কূলে।

সকাল বেলায় শিশির ভেজা
ঘাসের ওপর চলতে গিয়ে
হাল্কা মধুর শীতের ছোঁয়ায়
শরীর ওঠে শিরশিরিয়ে।

আরও এল সাথে সাথে
নুতন গাছের খেজুর রসে
লোভ দেখিয়ে মিষ্টি পিঠা
মিষ্টি রোদে খেতে বসে।

হেমন্ত তার শিশির ভেজা
আঁচল তলে শিউলি বোঁটায়
চুপে চুপে রং মাখাল
আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়।

[সংকলিত]

হেমন্তে বাংলার রূপ

শারমিন নাহার ঝর্ণা

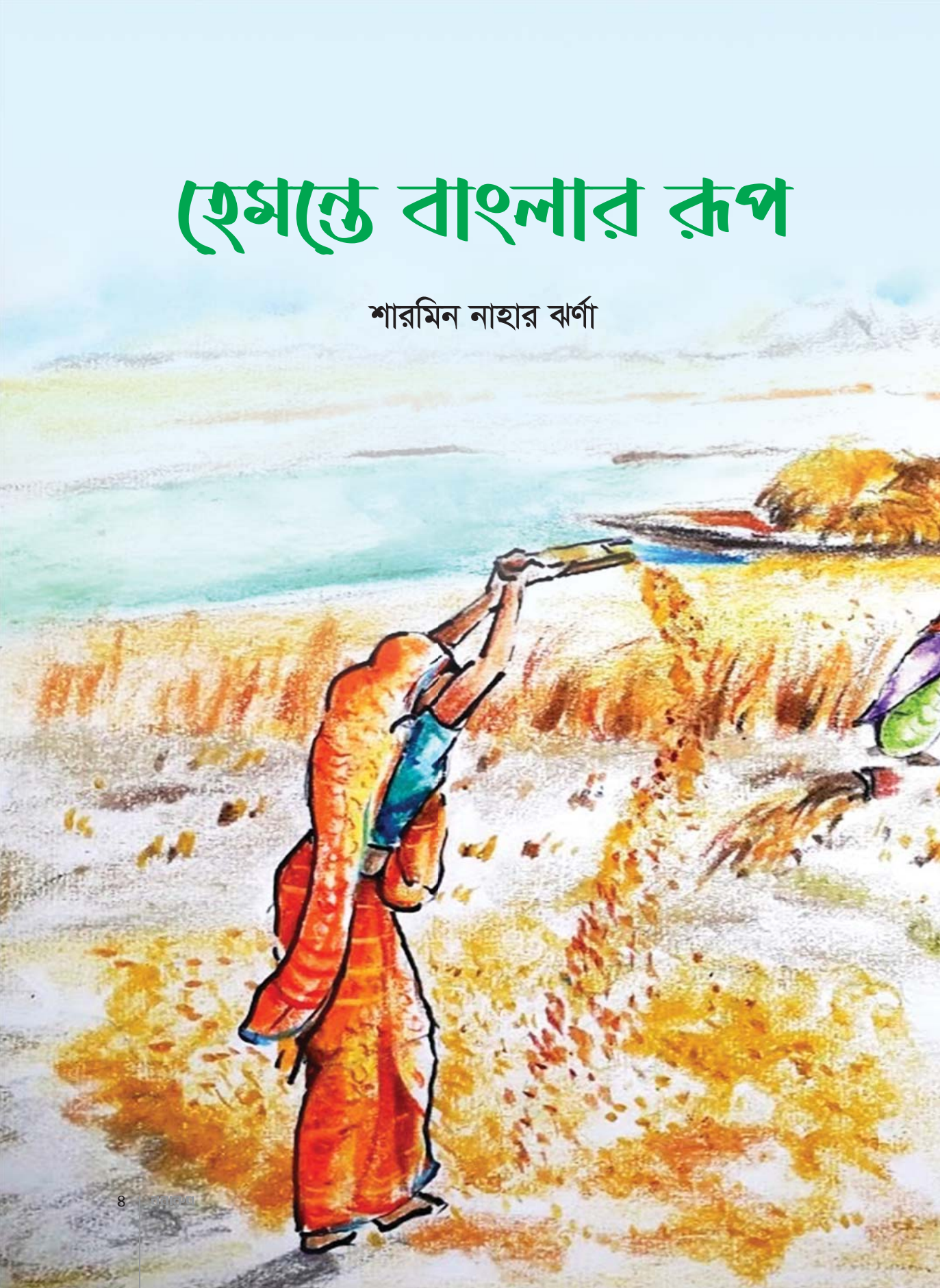

সময়ের নিয়মেই চলে এসেছে হেমন্ত। বইছে শীতল হাওয়া, ভোরের সবুজ ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু চকচক করছে মুক্তোর মতো। রূপের রানি শরৎ ঋতুর বিদায়ের পর পরই হেমন্তের পদার্পণ। ছয়টি ঋতুর মধ্যে হেমন্ত হলো চতুর্থ ঋতু, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মিলে হেমন্ত ঋতু। হেমন্ত মানেই সারি সারি পাকা ধান। এই সময় পাকা ধান শীতল হাওয়ায় দোলে, হালকা হালকা সোনালি রোদের পরশ লেগে চকচক করে সেই ধান।

এমন অপরূপ শোভা দেখে মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মানুষের মনকে বিমোহিত করে হেমন্তের সোনালি প্রকৃতির রূপ। আনন্দ আর খুশির জোয়ার ভাসে প্রতিটি কৃষকের ঘরে ঘরে। কৃষান-কৃষানির চোখে নতুন স্বপ্ন। আনন্দ আর খুশি নিয়ে নতুন ধানে গোলা ভরে, শুরু করে নবান্ন উৎসব। সবার ঘরে তৈরি হয় অনেক রকম পিঠাপুলি, পায়েস। ঢেঁকির ধাপর ধুপুর শব্দে চারিদিক মাতোয়ারা হয়, মন খুশিতে উদাস হয়ে যায়।

হেমন্তকালে বর্ষার পানি শুকিয়ে যাবার পর মাটি যেন ফিরে পায় নব রূপ। খালবিল শুকিয়ে গেলে অনেক ধরনের সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়, যেমন- কই, পুঁটি, খয়রা, শিং, বোয়াল, বাইম, টাকি ইত্যাদি। এসব দেশীয় মাছ হেমন্ত ঋতুতে অনেক বেশি পাওয়া যায়। বিশেষ করে যখন গ্রাম অঞ্চলের বিল-হাওর-বাঁওড় শুকিয়ে যায় তখন এসব মাছ পাওয়া যায়। গরম ভাতের সাথে পুঁটি মাছ ভাজির গন্ধ ভেসে আসে গ্রামের কোনো কোনো ঘর থেকে।

হেমন্তে অনেক ধরনের ফুল ফোটে। শিউলি, গন্ধরাজ, দেব কাঞ্চন, হিমঝুরি, অশোক, মল্লিকা, হাসনাহেনা এসব ফুলের মিষ্টি সুবাস বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ভোরবেলায় শিউলি ফুল কুড়িয়ে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা মালা গাঁথে। অন্য রকম এক আনন্দের অনুভূতি জাগে হৃদয়ে।

সকালে হালকা কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকে মাঠ, পাখিদের কিচিরমিচির কলরব, শিশিরভেজা ঘাস, অজস্র শিউলি ফুল শিউলি তলায় পড়ে থাকে, কোথাও কোথাও খেজুর গাছের সাথে বাঁধা রসের হাঁড়ি, হালকা রোদের পরশে সবুজ পাতা হেসে ওঠে। অপূর্ব সৌন্দর্যে ফুটে ওঠে হেমন্তের মিষ্টি সকাল। হেমন্তকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে, হালকা নীল রঙে সাজে বিকেলের আকাশ, মাঝে মাঝে রংধনু ওঠে। অতিথি পাখিদের আনাগোনা দেখা যায়, শুনশান নীরবতায় হেমন্তের স্নিগ্ধ বিকেলে মন প্রফুল্লতায় ভরে। রাতের আকাশে ঝকঝকে জোছনার আলো কৃষান-কৃষানির মনে জাগিয়ে তোলে নতুন স্বপ্ন নতুন আশা। রাত জেগে তারা নতুন ধান গোলায় ভরে, জোছনার আলোয় রাত জেগে তারা কাজ করে আর মনের সুখে ভাটিয়ালি গান গায় খুব সুখের মুহূর্তে।

হেমন্তের হালকা হালকা শীতল হাওয়া শীতের পূর্বাভাস, হেমন্ত ঋতুর পর শীত আসে। হেমন্তে প্রকৃতি সাজে অপরূপে, হেমন্তের এই রূপ-স্নিগ্ধতা ছড়ায় সোনার বাংলায়। বারবার ফিরে আসুক অপরূপ হেমন্ত দুয়ারে, উদাস হয়ে মনটা ভাসুক খুশির জোয়ারে। ❑

প্রাবন্ধিক

হেমন্তের ফুল

মো. ইকবাল হোসেন

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস নিয়ে হেমন্ত ঋতু গঠিত। শরৎকালের পর এই ঋতুর আগমন। এর পরেই আসে শীত, তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস। এক সময় বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। কারণ, ধান উৎপাদনের ঋতু হলো এই হেমন্ত। বর্ষার শেষ দিকে বোনা আমন-আউশ শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে ধান পরিপক্ব হয়। বাংলার প্রকৃতিতে হেমন্ত পুরোপুরি ফুলের ঋতু নয়। তবুও এ সময় ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনী, হিমঝুরি, দেব কাঞ্চন, রাজ অশোক, ছাতিম, বকফুল প্রভৃতি ফুল। হেমন্তের কিছু ফুলের কথা নবারুণ বন্ধুদের জন্য–

বাংলার প্রকৃতিতে শরৎ ও হেমন্তের ফুল শিউলি। সন্ধ্যায় এর ফুলকলিরা মুখ তোলে। তাই হেমন্ত রাত্রি শিউলির ঘ্রাণে ভরপুর। আবার ঝরে পড়ে নিশিভোরেই। স্নিগ্ধবর্ণ শিউলির সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। শিউলি ফুল ছাড়া কোনো বাগানই যেন পরিপূর্ণ হয় না।

হেমন্তের আরেকটি ফুল হলো ছাতিম। কদম ফুল যদি বর্ষার দূত হয়, ছাতিম ফুল তবে হেমন্তের। ছাতিমই একমাত্র বৃক্ষ, যেটি হেমন্তের উঠানে দাঁড়িয়ে প্রস্ফুটন আর সুগন্ধের প্লাবনে শীতকে অভ্যর্থনা জানায়। হেমন্তের রাতে শীতল বাতাসে হালকা সবুজাভ সাদা রঙের ছাতিম ফুলের সুগন্ধে মানুষের হৃদয় ও মন তৃপ্ত হয়ে ওঠে। ছাতিমগাছের কাঠ নরম। এটি দ্রুত বেড়ে ওঠে। ডাল-পাতা এমনভাবে সেজে ওঠে যেন তপ্ত দুপুরে পথিকের জন্য ছাতা মেলে দাঁড়িয়ে আছে কোনো আপনজন। তাই তো ছাতিমকে নিয়ে পথের পাঁচালীতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

'তাহার পর সকলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হয়, ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে হেমন্তের আঁচলাগা শিশিরাদ্র নৈশবায়ু ভরিয়া যায়।'

দেবকাঞ্চন ও হিমঝুরি এই ঋতুর অন্যতম ফুল। এর মধ্যে হিমঝুরি সহজে দেখা মিলে না। গন্ধরাজ, মল্লিকা, রাজ-অশোক, বকফুল, কামিনী–এই ফুলগুলোর প্রস্ফুটন অন্য ঋতুতে হলেও হেমন্তেও তাদের দেখা যায়। এছাড়া এখন হেমন্তে কদম ফুলও ফুটছে। নানা রঙের গোলাপ ফুল সারা বছরই ফুটে থাকে। কাশফুল শরতের হলেও হেমন্তেও চোখে পড়ে। এছাড়া হেমন্তের শুরুতে বরই গাছে ফুল এলে মৌমাছির গুনগুনানি শুরু হয়ে যায়। দারুণ মিষ্টি ঘ্রাণ এই বরই ফুলের। এ সময় বরই গাছের ডালে টুনটুনি ও চড়ুইয়ের ওড়াউড়ির দৃশ্য প্রকৃতিও মানুষকে স্মৃতিকাতর করে তোলে।

তাছাড়া হেমন্তে কিছু অপ্রচলিত ফুলও ফোটে। যেমন–বামনহাটি, বনওকরা ও দণ্ডকলস। এর মধ্যে বামনহাটি ফুল সাদা, ডালের আগায় প্রায় দেড় সেন্টিমিটারজুড়ে বিস্তৃত পরিসরে ফোটে। নতুন ফুল লালচে রেখাযুক্ত, নলাকার। সাধারণত ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা ও রোমহীন। বামনহাটি দেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, রংপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ফুল ফোটার মৌসুম জুলাই থেকে অক্টোবর।

অন্যদিকে বনওকরা বুনো গাছ। এটি রাস্তার ধারে, নদীর পাড়ে বা ঝোপঝাড়ে আগাছার মতো জন্মে। দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এ গাছের দেখা মেলে। আর দণ্ডকলস ফুল দেখা যায় বেশি শর্ষে ক্ষেতে। ফুলটিতে আছে মধু। এ তিনটি গাছেরই রয়েছে অনন্য ভেষজ গুণ।

হেমন্তের মাঠে মাঠে শিশিরকণা ঝরে। এ সময় সোনালি ধানের ঘ্রাণ, আকাশের তারা, চাঁদনি রাত আর এসব ফুলের ঘ্রাণ প্রকৃতি প্রেমীদের জীবনে মাধুর্য বয়ে আনে। কবি জীবনানন্দের ভাষায়–

'বাঁশপাতা-মরা ঘাস-আকাশের তারা!/ বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!' ❑

প্রাবন্ধিক

পাকা ধান

গাজী আরিফ মান্নান

পাকা ধানের আকুল করা ঘ্রাণে
সকাল-দুপুর দোলা দেয় যে প্রাণে,
মনের সুখে ধান কেটে যায় চাষা
আনন্দে তাই নেই তো কোনো ভাষা।

নিজের কাঁধে ধানের গোছা টানে
অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে আনে,
ঘাম ঝরানো সোনার ফসল হাতে
ঝাড়াই মাড়াই করলো দিনে-রাতে।

রোদে শুকায় কৃষানি-বউ পোলায়
ঝুড়ি ভরে ঢাললো কৃষক গোলায়,
কাজের শেষে বসলো সবাই পাশে
তাকিয়ে দেখে, সবাই আবার হাসে।

ভোরের রক্তিম সূর্য যখন ওঠে
আগুন জ্বেলে কৃষানি বউ ছোটে,
নতুন ধানের বানায় পিঠা পায়েস
খেয়ে-দেয়ে করলো সবাই আয়েশ।

হেমন্ত এলে

সাজ্জাদ হোসেন লিখন

হেমন্তের সকালে ঘাসের গায়ে শিশিরের দানা
খালি পায়ে হেঁটে চলি নেই তো কোনো মানা।

হাসিভরা মুখে চাষি কাটে সোনা ধান
হাসি আর উল্লাসে জুড়ায় মনপ্রাণ।

উৎসবে মেতে উঠে সকলের বাড়ি
নতুন ধানের চাল দিয়ে ভরে যায় হাঁড়ি।

হেমন্ত এলে নানা স্বাদের পিঠা ঘ্রাণে প্রাণভরে
নবান্ন উৎসব চলে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে।

বাংলার রূপ

আনোয়ার হোসেন প্রধানীয়া

সবুজে ঘেরা স্বপ্নপুরী, সোনালি বাংলার রূপ,
ধানের শীষে দোলে হাওয়া, মাটির ঘ্রাণে অনুপ।
পথের ধারে কাশের মাঠে খেলে শিশিরকণা,
নদীর বুকে ভাটিয়ালি গান, ছড়ায় সুখের বর্ণনা।

পাখির গানে ভোরের আলো জাগায় মধুর সুর,
প্রকৃতির এই রূপ দেখে হৃদয় হয় বিভোর।
মেঘলা আকাশ ছুঁয়ে আছে কদম ফোটার খেয়ালে,
বৃষ্টির নাচে ঝমঝমিয়ে হাসি পড়ে গ্রামবাংলার গালে।

পলিমাটি সোনার মতো ফলায় সোনার ধান,
কৃষকের ঘামে ভিজে উঠে দেশের সবুজ প্রাণ।
শাপলা-শালুক জলে ভাসে, পদ্ম ফুলের হাসি,
সন্ধ্যাবেলায় মাঠের শেষে বাজে রাখালের বাঁশি।

হেমন্তিকা

মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

হেমন্তকে করব বরণ
আমন ধানের শীষে
মাঠ-প্রান্তর ফুল-ফসলে
দুঃখ আবার কী সে?

কুটুম পাখি ডাক দিয়েছে
আসবে কুটুম বাড়ি
পিঠে-পায়েস রান্না হবে
প্রাণটা নেবে কাড়ি।

শিশির ঝরা হিম কুয়াশায়
উঠবে ভোরের রবি
মাঠ-বনানীর হেমন্তিকা
হরিৎ বরণ ছবি।

আকাশ পারে-নীলের ছোঁয়া
যাচ্ছে পালের নাও
নদীর জলে মাল্লা-মাঝি-
উজল সকল গাঁও।

হেমন্ত আজ চাষির ঋতু
ধান সোনালি মাঠ
গোলা ভরায় হেমন্তিকা
বসছে খুশির হাট।

গল্প

হযরত চাচার প্রতিদিন

শিবশঙ্কর পাল

বিন্তি যখন নিজ গ্রামের কিন্ডার গার্টেন স্কুল ছেড়ে শহরে সরকারি স্কুলে পড়ার সুযোগ পেল তখন ওর কয়েকজন নতুন বান্ধবী জুটে গেল। ক্লাসের সকলকে ওর আপন মনে হলেও তিথি, মল্লিকা, সারিয়া ওর খুব কাছের বান্ধবী। ওরা কয়জন প্রতিদিন একই বেঞ্চে বসে। বাড়ি সকলের আলাদা জায়গায় হওয়াতে এক সাথে স্কুলে আসতে পারে না। কিন্তু স্কুল ছুটি হলে এক সাথে গেট দিয়ে বের হয়। তারপর সকলে নিজেদের মা-বাবার সাথে বাড়িতে যায়।

বিন্তিরা এখন ক্লাস ফোরে পড়ে। সরকারি এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিল ক্লাস থ্রিতে। প্রায় দেড় বছরে কত সহপাঠীর সাথেই যে চেনা-পরিচয় হয়েছে তার হিসাব নেই। এমনকি বড়ো ক্লাসের আপুদের সাথেও ভাব হয়েছে। কখনও কখনও গল্প করেছে, সময় কাটিয়েছে তাদের সাথে। আপুরাও অনেক ভালোবাসে আর সহযোগিতাও করে ওদের। এদের সাথে স্কুলের আরও তিনজনের সঙ্গে বিন্তিদের বন্ধুত্ব হয়েছে। তারা অবশ্য তাদের সমবয়সি কেউ না, বা বান্ধবীও না। একজন স্কুলের পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রকাশ কাকা। সকালবেলা ঝাড়ু হাতে স্কুলের মাঠের আশপাশে ঘুরে ঘুরে কাগজের টুকরা, চিপসের খালি প্যাকেট, চকলেটের কাভার ইত্যাদি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করেন। স্কুলে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আগেই স্কুল

মাঠটা দেখতে কত সুন্দর লাগে! মনে হয় একেবারে সবুজে সবুজময়। খালি মাঠে টুপ করে বসে পড়তে কোনো অসুবিধাই হয় না। আর সবার আসার আগেই পুরো ক্লাসরুমগুলো তো ঝকঝকে তকতকে থাকে। প্রথম প্রথম বিন্তিরা স্কুলের মাঠে বাদামের ঠোঙা কিংবা চিপসের খালি প্যাকেট ফেললে প্রকাশ কাকা চোখ পাকিয়ে তাকাতো, 'এ্যাই মেয়ে, কাগজ ফেললে যে!... আর ফেলবে না কখনো।'– এভাবেই প্রকাশ কাকার সাথে পরিচয় ঘটে সবার। বিন্তিদের সাথেও এভাবেই পরিচয় হয়েছিল। প্রকাশ কাকা কাগজ কিংবা ময়লা ফেলা দেখলেই বলত, 'এবারের মতো মাফ করে দিলাম। আর যেন না-ফেলা হয়। কাগজ/ঠোঙা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে।'– বলেই হাসিমুখে সেখান থেকে সরে পড়তেন।

দ্বিতীয় জন– স্কুলের গেটম্যান নাজির দাদু। গেটম্যান হলেও স্কুলের সর্বত্র তার বিচরণ। পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রকাশ কাকার মতোই পুরো স্কুল তার হাতের মুঠোয় যেন। তবে গেটম্যান হিসেবে প্রচণ্ড কড়া মেজাজের। ঠিক সময় মতো স্কুলের গেট খুলে দেন, আবার সময় হলেই বন্ধ করেন। কাউকেই স্কুল সময়ে বাইরে বের হতে দেন না। স্কুলের সকলকেই তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন।

আর স্কুলের সব ক্লাসের মেয়েরাও তাঁকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করে। কারণ, অনেক আগে থেকে তিনি এই স্কুলে চাকরি করেন। বয়স কত বলা মুশকিল। তবে শরীরটা এখনো শক্তপোক্ত। মাথার চুল কিছুটা কমে গেলেও গাল-মুখ সাদা দাড়িতে ঢাকা। হাসলে সাদা দাঁতগুলো এখনো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। গুল বা পান জাতীয় কোনো রকম নেশা তার নেই। সারাদিনের মধ্যে তাকে কেউ কোনো কিছু খেতেও দেখে না। দুপুর হলে টিফিন টাইমে সকলের মতো টিফিন বক্স খুলে ভাত-মাছ খায় কেবল।

আর তৃতীয়জন হলেন– হযরত চাচা। স্কুলে চাকরি না করলেও স্কুলের বাইরে গেটের সাথে তার বারো-ভাজার অস্থায়ী দোকান। স্কুলের সামনের একমাত্র দোকানদার তিনি। মাসিক বেতন নেই তার, দিনমজুরের মতো

প্রতিদিনের রোজগার তার। প্রতিটা ক্লাসে ছাত্রীদের টিফিনে নাশতা দেওয়া হয়। তারপরও হযরত চাচার বেচাবিক্রি মোটামুটি ভালো। তার দোকানে মেলে টাটকা বারোভাজা, বাদামভাজা, বুটভাজা, ডাবলি মটরভাজা, আর চালতার আচার। আমড়ার সময় কাঁচা আমড়া ছিলে বিক্রি করেন। বারোভাজা মাখেনও তিনি খুব যত্ন করে, স্বাদও হয় বেশ! বারোভাজা মাখার দৃশ্যটা তার দেখার মতো– কাচের প্রত্যেকটা বয়াম থেকে একমুঠো করে মুড়ি, চানাচুর, বাদাম, চিড়াভাজা, চালভাজা একটা স্টিলের মগের ভেতর ফেলে তাতে পেঁয়াজ ও মশলা মাখানো তেল ঢেলে একটা চামচ দিয়ে শব্দ করে মাখিয়ে কাগজের ঠোঙায় ঢেলে দেন। হযরত চাচা একেবারে সৎ-সাহস নিয়েই বলেন, 'স্কুলে ছোটো বাচ্চারা পড়ালেখা করে। এখানে আমি কখনো কোনোদিন বাসি খাবার নিয়ে আসি না। আমি অল্প করে খাবার বানিয়ে আনি যেন দিনকে দিনই ফুরিয়ে যায়।' স্কুলের ভেতর থেকে হযরত চাচার মুখটা পুরোপুরি দেখাই যায় না। কারণ, তিনি গেটের ওপারে একপাশে দাঁড়িয়ে দোকানদারি করেন। গেট খোলা নিষেধ তাই সকলে গেটের একপাশের একটু ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে জিনিস কেনে। অবশ্য শিক্ষকরা যখন বাইরে যান তখন তার সম্মুখ থেকেই খাবার কেনেন। নাজির মিয়ার মতো হযরত চাচাও সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলেন।

বিন্তিরা হযরত চাচার কাছ থেকে একেক দিন একেক রকমের খাবার কিনে খায়। হযরত চাচাও বেশ যত্ন করে হাসিমুখে সকলের হাতে তার বারোভাজা কিংবা অন্যান্য খাবার তুলে দেন। তার মুখে কোনোদিন বিরক্তিভাব বা খারাপ আচরণ কেউ দেখেনি।

বিন্তিদের ক্লাস সকালে, অর্থাৎ মর্নিং শিফটে। বিন্তি স্কুলে ঢোকার মুহূর্তে অনেকদিন গেটের বাইরে তাকিয়ে খুঁজেছে হযরত চাচাকে কিন্তু পায়নি। কারণ হযরত চাচা অত সকালে তার দোকান নিয়ে আসেন না। স্কুলে ক্লাস করে টিফিনে দেখতে পেত তাকে। একদিন ঘটল এক ঘটনা। বিন্তিরা দলবেধে হযরত চাচার কাছে যেতেই দেখে গেটের ওপাশে ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে। এমনকি তাদের মতো অনেকেই ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে। সেদিনের মতো তাদের আর বাদাম খাওয়া হলো না। এভাবে একদিন– দু দিন– তিনদিন গেল, হযরত চাচা এলেন না। চতুর্থ দিনে তিথি স্কুলে এসে জানালো, 'হযরত চাচার অসুখ করেছে। তাই আর আসছে না।'

হযরত চাচার অসুখের কথায় সকলের মন খারাপ হয়ে গেল। স্কুলের কাছেই তিথিদের মহল্লাতেই তিনি থাকেন। গতকালই তিথি এ খবর সংগ্রহ করেছে তার বাবার কাছ থেকে। শুনেই তখন তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। টিফিন টাইমে সকলে আর অন্যকিছু না খেয়ে ক্লাসে ফিরে গেল।

ক্লাসে বসে কথাটা বিন্তিই প্রথমে সকলের সামনে প্রকাশ করল। কারণ স্কুল ছুটি হয়ে গেলে আর কথা বলা যাবে না। বিন্তি বলল, 'আচ্ছা আমরা কয়েকজন মিলে হযরত চাচার জন্য কিছু করতে পারি না?'

বিন্তির কথায় সকলেই একসঙ্গে তার দিকে তাকালো। হ্যাঁ, সত্যি তার জন্য কিছু করা যায়ই তো! আসলে সকলেই মনে মনে এই কথাটা ভাবছিল। বিন্তি কথাটা তুলে সকলের মনটা হালকা করে দিল। মল্লিকা বলল, 'হ্যাঁ, তাকে সহায়তা করতে পারলে আমাদের ভালোই লাগবে। আজ তিনদিন ধরে উনার দোকানটা বন্ধ।' সারিয়া বলল, 'কী অসুখ করেছে উনার? একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।'

অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আগামীকাল স্কুল ছুটির পর হযরত চাচার বাসায় যাবে সবাই। তার আগে সকলের মায়ের কাছে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে হবে। কারণ সকলের মা সবার সাথে স্কুলে আসে। আর কাউকেই একলা ছেড়ে দিতে চাইবেন না। আর কিছু সহায়তা করতে হলেও তো মা-বাবাকে বিষয়টা জানাতে হবে।

বিন্তি বাড়ি গিয়ে আগে মায়ের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল। পরে বাবাকে জানাতেই বাবা খুশি মনে কিছু টাকা দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

পরদিন স্কুলে ক্লাস শুরুর আগেই সকলে এক দফা মতবিনিময় করে ফেলল। সবার মা-বাবাই রাজি

হয়েছেন। স্কুল ছুটির পর সকলে এক সাথে মায়েদের নিয়ে হযরত চাচার বাড়িতে যাবে।

হযরত চাচার বাড়ি খুঁজে পেতে কাউকেই বেগ পেতে হলো না। কারণ, 'ভাজাওয়ালা'র কথা বলতেই সকলেই চিনলেন তাকে। তিথিদের পাড়াতে হলেও ওদের বাড়ি থেকে অন্য দিকে হযরত চাচার বাড়ি। ছোটো একটা টিনের চালার বাসায় ভাড়া থাকেন তিনি। পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও তিন ছেলে-মেয়ে। বড়ো মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক আগে। এখন আছে এক ছেলে আর এক মেয়ে। বড়ো মেয়েটা বাবার অসুখের কথা শুনে এসেছে এখানে। বিন্তিদের অনেককে দেখে বড়ো মেয়েসহ সকলেই অবাক হয়ে গেল। হযরত চাচা নিজ ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি এখন অনেকটা সুস্থ, তবে শরীরটা দুর্বল হয়ে আছে। তিনি এতগুলো মানুষকে একসঙ্গে দেখে হকচকিয়ে গেলেন এবং বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। বিন্তির মায়েরা তাকে উঠতে নিষেধ করলেন। হযরত চাচার স্ত্রী ঘরে থাকলেও তার বড়ো মেয়েই সকলের সাথে কথা বলল। কথার ফাঁকে এক সময় সকলকে চায়ের কথা বলতেই মায়েরা তাকে নিষেধ করল। হযরত চাচার জন্য আগেই মায়েরা সকলের টাকার কিছু অংশ দিয়ে কিছু আঙুর, আপেল, কমলা কিনেছিলেন। বিন্তির মা সেগুলো তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন। আর তিথির মায়ের কাছে রাখা কিছু টাকা তিনি তুলে দিলেন ঔষধ কেনার জন্য।

একটু পরে সকলেই যখন যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখন হযরত চাচা হাতের ইশারায় চার মেয়েকে সামনে ডাকলেন। বিন্তি, তিথি, সারিয়া, মল্লিকা– চারজনই হযরত চাচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হযরত চাচা ওদের মাথায় হাত রেখে বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদে ফেললেন, 'আপনেরা বড়ো হোন মা, আপনেরা অনেক বড়ো হোন। ❑

গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক

নবান্নের হাসি

আব্দুস সাত্তার সুমন

লাঙল কাঁধে নিয়ে, বীজ বুনি ছড়িয়ে
কাদামাটি কৃষকে, আঁকড়ে ধরে জড়িয়ে,
হেমন্তে ছেয়ে গেছে, ফসলের নবান্নের
তিলে তিলে লালন করা, স্বপ্ন আমাদের।

নবান্নের উৎসবে, মুখরিত চারদিক
হেমন্ত বয়ে চলা, উদিত হয় সবদিক,
ফসলে নতুন খাবার, ঘরে উঠে সবার
দুঃখগুলো মুছে যাবে, প্রভু দিবে এবার।

সবুজ শ্যামল মায়াতে, ছেয়ে গেছে আবার
ফলিত কৃষানের, ঘামে ফসলের বাহার,
মেলা হবে মাহফিলে, লেখাপড়া কত
গোলাভরা ধান হবে, পূরণ হবে শত।

প্রখর রোদে হালকা শীতে, কাঁপুনিতে ঝুম
নতুন ধানের পিঠাপুলি, নেই কারো ঘুম,
গ্রামের বাতাসে, মৌ মৌ সুগন্ধে ছড়ানো
হাসিখুশি মুখগুলো, প্রেমমাখা জড়ানো।

পাখির বাসা

রফিকুর রশীদ

রতনের নানাবাড়ি ঢাকা থেকে অনেক দূরে, সোনাপুরে। শহরে নয়, ছায়াঢাকা এক গ্রামে। জেলার নাম মেহেরপুর। ঢাকার সাথে যোগাযোগ খারাপ নয়। প্রতিদিন গোটা বিশেক কোচ চলাচল করে। কত মানুষ যায় আসে। শুধু রতনদেরই যাওয়া হয় না।

অথচ এই সোনাপুরেই রতনের জন্ম। মায়ের কাছে তা-ই শুনেছে। আরো কত কথা শুনেছে এই গ্রামের। রতনের মা গ্রামকে বলে গাঁ। গাঁয়ের পাশেই ভৈরব নদ। সেই নদে নৌকা ভাসে। দূর থেকে মাছরাঙা আসে। ঠোঁটের ফাঁকে মাছ ধরে নিয়ে উড়ে যায়। দূরে যায়, আবার আসে।

অনেকদিন পর রতন এবার সোনাপুর গ্রামে এসেছে। অনেক দিন নয়, অনেক বছর পরে। এতদিন কেন আসা হয়নি, সে জানে না। এবার এসেছে নানির অসুখের খবর পেয়ে। কে জানে কী অসুখ! রতনকে জড়িয়ে ধরে একবার কাঁদে নানি। মাকে জড়িয়ে ধরে আবার কাঁদে। কান্না যেন শেষ হয় না নানিবুড়ির।

রতনের মামাতো ভাই মানিক। বয়সে একটুখানি বড়ো। রতনের মা বলেছে, ছ-সাত মাসের বড়ো হবে মানিক। রতনকে শিখিয়েছে ভাই বলে ডাকতে। দুইজনেই পড়ে ক্লাস ফোরে। খুব সহজেই দুজনের গলায় গলায় ভাব হয়ে যায়। দু'জনেই দুজনের নাম

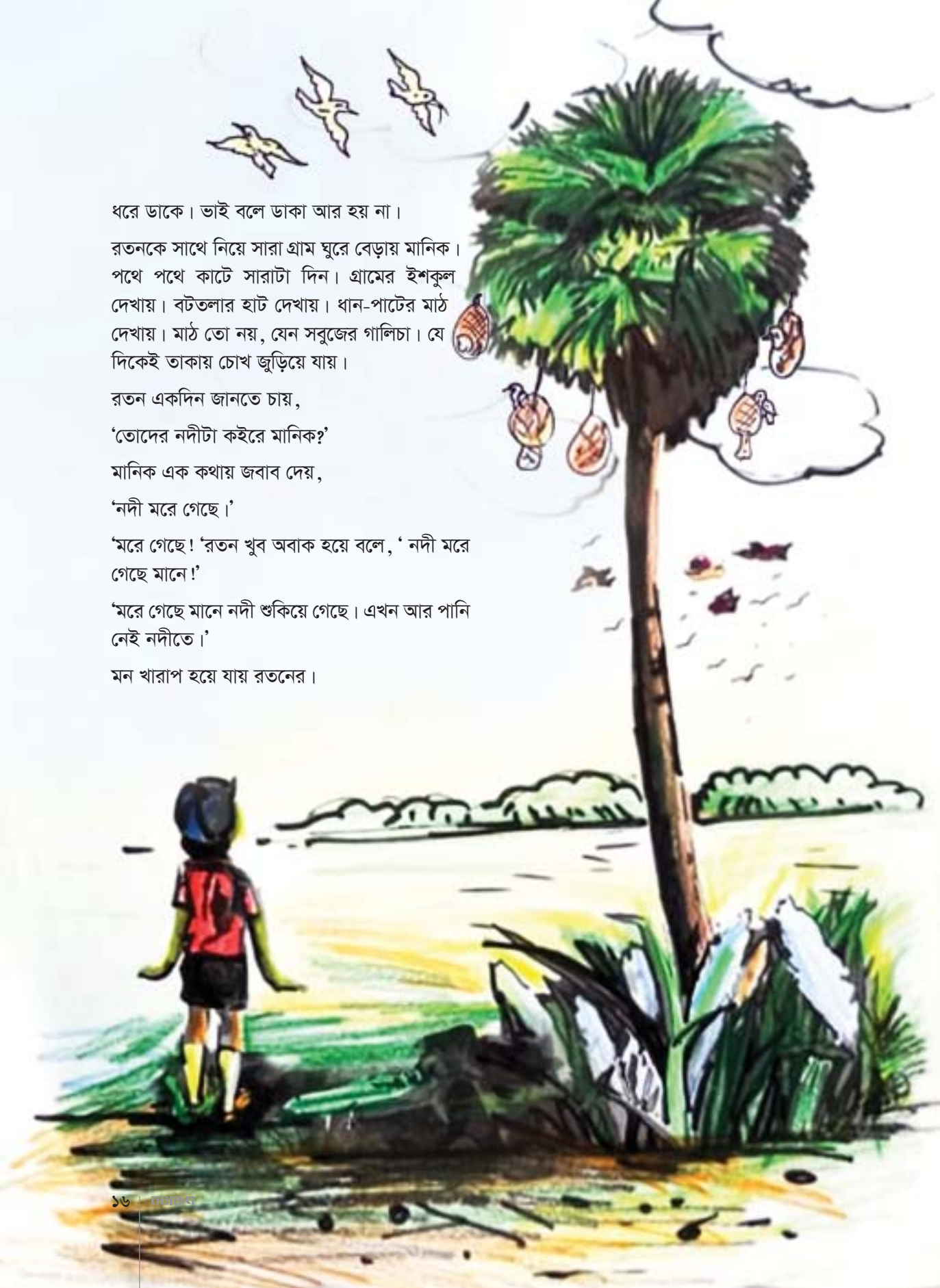

ধরে ডাকে। ভাই বলে ডাকা আর হয় না।

রতনকে সাথে নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায় মানিক। পথে পথে কাটে সারাটা দিন। গ্রামের ইশকুল দেখায়। বটতলার হাট দেখায়। ধান-পাটের মাঠ দেখায়। মাঠ তো নয়, যেন সবুজের গালিচা। যে দিকেই তাকায় চোখ জুড়িয়ে যায়।

রতন একদিন জানতে চায়,

'তোদের নদীটা কইরে মানিক?'

মানিক এক কথায় জবাব দেয়,

'নদী মরে গেছে।'

'মরে গেছে! 'রতন খুব অবাক হয়ে বলে, ' নদী মরে গেছে মানে!'

'মরে গেছে মানে নদী শুকিয়ে গেছে। এখন আর পানি নেই নদীতে।'

মন খারাপ হয়ে যায় রতনের।

মায়ের কাছে নদীর কথা অনেক শুনেছে। এখন আর সেই নদীকেই দেখা যাবে না! এর নাম ভৈরব, খুব মনে আছে তার। কোথায় সেই নদী?

ভয়ে ভয়ে মানিকের কাছে সে জানতে চায়,

'আচ্ছা, নদী তো নেই, নৌকা আছে তো নদীর তীরে?'

মানিক হেসে ওঠে। শহরের ভাইটির বোকামিতে সে মজা পায়। কিন্তু রতনের খুব খারাপ লাগে। রেগে উঠে বলে,

'হাসছিস কেন?'

রতনের কাঁধে হাত রেখে মানিক বলে,

'নদী ছাড়া কি নৌকা চলে?'

'মা যে আমাকে নদীর কথা বলেছে, নৌকার কথা বলেছে!'

মানিক এবার বুঝিয়ে বলে,

'ফুপু বলেছে সে সব অনেক আগের কথা। এখন সেই নদীও নেই, নৌকাও নেই।'

রতন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। মানিকের চোখে চোখ রেখে বলে,

'তাহলে কি মাছরাঙাও নেই?'

'মাছরাঙা?'

রতন বুঝিয়ে বলে,

'হ্যাঁ, মাছরাঙা পাখি। ঠোঁটের ফাঁকে মাছ ধরে নিয়ে যায় ছোঁ মেরে, দেখিসনি?'

একগাল হাসি ছড়িয়ে মানিক জানায়,

'তা দেখেছি। খালবিলে এখনো দু' চারটি দেখা যায়। তোকেও দেখাতে পারি।'

শুনে খুশি হয় রতন।

নানিবাড়ির ঠিক পেছনে এক জোড়া তালগাছ দাঁড়িয়ে। পাতায় ছাওয়া ঝাঁকড়া মাথা। বাতাসে দোল খায় তারা। যেন যমজ ভাই। গলাগলি ভাব। তালগাছের পাতার সাথে ঝুলে আছে বাবুই পাখির বাসা। বেশ দুলছে আপন মনে।

বাবুই পাখির বাসা আগে কখনো দেখেনি রতন। দূর থেকে দেখে দেখে আশ মেটে না, হাতের মুঠোয় পেতে চায় সে। বায়না ধরে, একটা বাসা তাকে এনে দিতেই হবে। একজন গাছিকে গাছ থেকে একটা বাসা নামিয়ে এনে দিলে রতন খুব খুশি হয়। বাসাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে।

হঠাৎ সেই বাসার মধ্যে কিচিরমিচির ধ্বনি শোনা যায়। রতন দেখতে পায় বেশ কয়েকটা পাখির ছানা ভেতরে নড়াচড়া করছে।

একটা বাবুই পাখি এসে রতনের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। আবার একবার ঘুরে যায়। রতন এখন কী করে! উঠোনে দাঁড়িয়ে তালগাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মানিক এসে বড়ো মানুষের মতো করে বলে,

'একেই বলে মায়ের টান, বুঝেছিস?'

রতনের মা-ও উঠোনে এসে যোগ দিয়ে বলে,

'এই যেমন আমার মায়ের টানে আমি এসেছি সোনাপুরে। বাচ্চাগুলোকে তুই ফিরিয়ে দে খোকা।'

রতন ঘাড় দুলিয়ে জানায়,

'সেই ভালো মা। শিশু ভালো থাকে মায়ের কোলে।'

রতনের মা খুব খুশি হয়। নিজের ছেলেকে কোলের মধ্যে টেনে নেয়। তারপর বাবুই পাখির বাসাটা হাতে তুলে মানিককে দিয়ে বলে,

'আব্দুল গাছিকে আবার ডেকে নিয়ে আয় বাপ। পাখির বাসাটা সে ওই গাছে বেঁধে দিয়ে আসুক।'

এ ঘোষণা শুনে ছোট্ট পাখির ছানারাও যেন খুব খুশি হয়। আনন্দে বাসার মধ্যেই ডেকে ওঠে কিচিরমিচির করে। ❑

কথাসাহিত্যিক

ছোটোদের ছড়া

পিঠার আমেজ

সাকিবুল ইসলাম

ধান নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত
কৃষান-কৃষানীর দল
জোছনা মাখা হেমন্তের রাতে
হই-হুল্লোড় আর আনন্দ কোলাহল।

রান্নার ফাঁকে কৃষানি
ঝাড়ে কুলায় ধান
ধাপুর ধুপুর ঢেঁকি নাচে
গেয়ে হেমন্তের গান।

পিঠা-পুলির আমেজে
গাঁয়ের খোকা-খুকু হাসে
নবান্নের ঘ্রাণ ছড়িয়ে যায়
হেমন্তের বাতাসে।

সপ্তম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর উচ্চ বিদ্যালয়, দেবিদ্বার, কুমিল্লা

নতুন ধান

মৌমিতা আহমেদ মৌমি

আঁকাবাঁকা মেঠোপথে
গরু-মহিষের গাড়ি
আঁটি বাঁধা ধান নিয়ে
যাচ্ছে গ্রামের বাড়ি।

কৃষকের মুখে হাসি
পেয়ে নতুন ধান
তা দেখে কৃষানির
জুড়ায় মন-প্রাণ।

সোনাঝরা ধানের সুবাস
গ্রামের প্রতিটি ঘরে
নতুন ধানের পিঠা খেয়ে
মেতে উঠে সবাই সুরে সুরে।

ষষ্ঠ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল, ঢাকা

হেমন্তের প্রকৃতি

সোহেল আশরাফ সিদ্দিকী

নীলাকাশের গভীরে হারায় মেঘের দল
বাংলার বুকে শান্ত নদীতে বয়ে চলে জল।

শাপলা-শালুক ভাসে সকালের শিশিরে
সূর্য ওঠে ধানের ক্ষেতে, সোনার আলো বুনে তীরে।

বটবৃক্ষের ছায়া যেন আদি ইতিহাস
গাছের ফাঁকে খেলা করে রোদের সব নিশ্বাস।

পাখির ডাকে জাগে ভোরে কৃষকের প্রাণ
ঘামের গন্ধ মেশে মাটিতে, জাগায় জীবনের গান।

আকাশ জানে, মাটি বোঝে, নদী রাখে স্মৃতি
বাংলার রূপ-আনন্দ-বেদনার অনন্ত চিত্রিত পুঁথি।

দ্বিতীয় বর্ষ, নাসিরাবাদ কলেজ, ময়মনসিংহ

গল্প

বনের রাজা ও ডাক্তার

আবদুল লতিফ

বনের রাজা বাঘ। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। এখন আর আগের মতো গায়ে শক্তি নেই। চোখের জ্যোতিও ধীরে ধীরে কমে আসছে। কিন্তু তার এই দূর্বলতার কথা কাউকে বলতেও পারছে না। অন্য পশুপাখিরা জানলে তারা বাঘকে আর আগের মতো সমীহ করবে না। বাঘ খুব চিন্তায় পড়ে গেল। এভাবে চলে গেল অনেকদিন। চোখে ঝাপসা দেখায় শিকার ধরতেও বেশ সমস্যা হচ্ছে। ঠিকমতো শিকার ধরতে না পেরে পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে বাঘ দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

একদিন গহীন জঙ্গলে বিশাল বড়ো একটা গাছের নিচে মন খারাপ করে বসে আছে বাঘ। ওই গাছেই ছিল একটা ইঁদুর। অনেকদিন আগে যে বনের রাজা বাঘকে উপকার করার প্রতিজ্ঞা করে অপরাধের বড়ো শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিল। ইঁদুর সবিনয়ে রাজার মন খারাপের কারণ জানতে চাইল।

রাজা মনে করল ইঁদুরকে বলে আর কি হবে! কিন্তু ইঁদুরের কাকুতিমিনতির কারণে রাজা সব খুলে বলল। রাজাকে উপকারের এমন মোক্ষম সুযোগ ইঁদুর হাতছাড়া করতে চাইল না। বলল রাজামশাই, আমার জানামতে জঙ্গলের সবচেয়ে বড়ো চিকিৎসক শেয়ালি 'ডাক্তার ভিক্সেন আমাজন'। চিকিৎসা সেবার উপর রয়েছে তাঁর বড়ো বড়ো ডিগ্রি এবং বিস্তর অভিজ্ঞতা। আমাজন জঙ্গলে বহু বছর ধরে অসংখ্য জটিল রোগী সুস্থ করে শেয়ালি আমাদের এই জঙ্গলে তার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে। তার নামের শেষে 'আমাজন' মূলত ওই জঙ্গলের পশুপাখিরা ভালোবেসে যুক্ত করেছে। আশা করি আপনি তার কাছে গেলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ইঁদুরের কথায় বাঘ কিছুটা ভরসা পেল। বলল, তাহলে কীভাবে সেই ডাক্তার ভিক্সেন আমাজনের চিকিৎসা নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করো।

ইঁদুরের খুব ভালো বন্ধু এক কাকের সাথে আবার ওই ডাক্তারের বেশ ভালো সম্পর্ক। তাই ইঁদুর ছুটে গিয়ে কাককে ধরল ডাক্তারের সাথে বাঘের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে। বন্ধুর অনুরোধে কাক ছুটে গেল ডাক্তার ভিক্সেন আমাজনের কাছে। কাকের কাছে রোগীর কথা শুনে ডাক্তার বলল, আমি তো সব রোগীরই চিকিৎসা করি কিন্তু বাঘের চিকিৎসা করতে গেলে সে তো আমাকেই খেয়ে ফেলতে পারে।

কাক ফিরে এসে ইঁদুরকে সঙ্গে নিয়ে বাঘকে ডাক্তার ভিক্সেন আমাজনের সব কথা খুলে বলল। বাঘ বুঝতে পেরে বলল, ডাক্তার ভিক্সেন আমাজনকে বলো জঙ্গলের পাশের পাহাড়ে, পাথরের সরু কোনো গর্তে বসে একটু দূরত্বে থেকেই আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। যাতে ইচ্ছে করলেও শেয়ালির কোনো ক্ষতি করতে না পারি। এজন্য যা খরচ হবে পুরোটাই আমি বহন করব। কাক তখনই দ্রুত উড়ে গিয়ে বাঘের প্রস্তাবের কথা জানালো। নরম মনের ডাক্তার ভিক্সেন আমাজন বাঘের প্রস্তাবে রাজি হলো।

অল্প সময়ের মধ্যে পাথরের সরু গর্তে চেম্বার প্রস্তুত করল। বাঘ আসার সাথে সাথে চিকিৎসা শুরু করল। চোখের পরীক্ষার জন্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের এলোমেলো একটা চার্ট দেখিয়ে কোনটা কোনো বর্ণ জিজ্ঞেস করে। কিন্তু রাজামশাই তো হা করে তাকিয়ে আছে। তারপর ক্ষীণ স্বরে বলে আমি তো পড়াশোনা জানি না। কীভাবে বলব! পড়াশোনা না জানার কারণে অনেক লজ্জায় পড়ে গেলো বাঘ। ডাক্তার তো

পড়ে গেলেন মহাবিপদে। বললেন, আজ তাহলে চলে যান, দু-দিন পরে আবার আসবেন। এর মধ্যে আমি বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখব। বাঘ ফিরে যাওয়ার সময় মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো, সে তার উত্তরসূরীদেরকে অবশ্যই পড়ালেখা শেখাবে যেন তারা কখনো তার মতো লজ্জিত হতে না হয়। কারণ শিক্ষার মূল্য অনেক বেশি।

দু-দিন পরে আবার যথাসময়ে ডাক্তারের চেম্বারে বাঘ হাজির হলো। ডাক্তার এবার একটা বাংলা ঊ বর্ণের মতো জিনিস দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বলুন তো রাজামহাশয় এর তিনটা মাথা কোনদিকে আছে? বাঘ উত্তর দিলো ডানদিকে। ঊ সদৃশ বস্তুটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, কাছে দূরে নিয়ে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন। এভাবে বাঘের দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা করলেন। শেষে একটা আই ড্রপ দিয়ে বললেন, দিনে তিনবার দুই ফোঁটা করে দুই চোখে দিতে। আর একটা চশমা দিলেন নিয়মিত ব্যবহার করার জন্য।

চশমা পড়লে বাঘ সবকিছু আগের সুস্থ অবস্থার মতোই দেখতে পেল। এতে বাঘ খুব খুশি হয়।

একদিন বাঘের প্রচণ্ড ক্ষুধা পায়। জঙ্গলের পথে পথে খুঁজতে থাকে শিকার। দূর থেকে একটা হরিণ দেখতে পায়। ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে হরিণের দিকে এগুতে থাকে বাঘ। হরিণ আনমনে গাছের পাতা খাচ্ছে। বাঘের উপস্থিতি সে টেরই পায়নি। আরও একটু কাছে গিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে হরিণকে টার্গেট করে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। কিন্তু বুনোলতায় আঁটকে যায় বাঘের চশমা। বাঘ তখন সবকিছু ঝাপসা দেখে। আর হরিণ ততক্ষণে দেয় ভোঁ দৌড়।

শিকারটা তার হাতছাড়া হয়।
নিজের ভুল বুঝতে পেরে
নিজেই বাঘ টেনে ছেঁড়েন
নিজের মাথার চুল।

আর বাঘের ব্যর্থতা দেখে মজা পায় চারপাশের সব পশুপাখি। ❑

গল্পকার

হেমন্ত এলে

সাবিনা মাহবুব

সকালে ঘাসের গায়ে শিশিরের দানা
ছুঁয়ে দিতে নেই কোনো মানা
হাসিভরা মুখে ধান কাটে চাষি
ফসলের পাকা ঘ্রাণে ছুটে আসি।

নবান্নের উৎসব চলে ঘরে ঘরে
নানা স্বাদে পিঠা হয় প্রাণভরে
হেমন্ত এলে গ্রাম আনন্দে মাতে
ফুল ফোটে মেঠো পথের বাঁকে বাঁকে।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল, বাসাবো শাখা, ঢাকা

গল্প

নাম তার লালি

আঞ্জুমন আরা

খোকা তার বাবার সঙ্গে বাজার করতে গেলো। ঘুরে ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনছে তারা। মুরগির দোকানের সামনে পৌঁছানো মাত্রই খোকার চোখ পড়লো খাঁচায় রাখা একটা লাল মুরগির দিকে। সত্যিই মুরগিটা পছন্দ হওয়ার মতো। খোকাকে দেখা মাত্রই মুরগিটা ককক্, ককক্ করে উঠলো। মনে হলো খোকা যেন তার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা। দোকানদার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

- কী ব্যাপার!

এই ছেলেকে দেখার পর মুরগিটা এমন করে উঠলো কেন?

খোকা বাবাকে বলতে লাগলো -

-বাবা এই লাল মুরগিটা আমি নিবো। এটাকে আমি পুষবো।

খোকাদের বাড়ির ছয় তলায় একটি রুম বহুদিন ধরে খালি পড়ে আছে । অনেকে খোকার বাবাকে এখানে মুরগির খামার করতে বললেও ঝামেলার জন্য তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু আজ ছেলের পছন্দের কাছে তিনি হেরে গেলেন। আসলেই মুরগিটা খুব সুন্দর।

-ভাই এই মুরগি কি পোষা যাবে? খোকার বাবা জানতে চায়।

হ্যাঁ যাবে তো! এগুলো দেশি মুরগি। আমার কাছ থেকে দেশি মুরগি নিয়ে অনেকে পুষছে। প্রচুর ডিম দেয়। এই মুরগি পুষলে আপনাকে আর ডিম কিনে খেতে হবে না।

খোকার বাবাও মুরগিওয়ালার কথা শুনে মহাখুশি। কী আর করা, তিনি বেছে বেছে মোট চারটি মুরগি কিনে নিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলেন। খোকা লাল মুরগিটার নাম দিয়েছে লালি। মুরগি দেখে খোকার মা কিছু বলার আগেই বাবা ছেলে মিলে মুরগি পোষার সুফল বর্ণনা করে ফেললেন। অগত্যা তিনি তেমন কিছু না বলে আপন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ছয় তলার খালি ঘরটি এখন মুরগির বসতবাড়ি। পরের দিন ভোরবেলা খোকার বাবা অতি আগ্রহ নিয়ে ছাদে গিয়ে রুমের দরজা খুলে মুরগিকে খাবার দিলেন। অমনি মুরগিগুলো খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনি ভাবতেও পারেননি আদরের লালি তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে। নিমিষে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং মুরগিটাকে ডাকতে শুরু করলেন।

-আয় - আায়- আয়-

সে তো রুমে ঢুকলোই না বরং লাফিয়ে ছাদের দেয়ালের উপরে উঠলো।

তিনি আবার ডাকলেন,

আয়- আয় - আয়--

এদিক-ওদিক কয়েকবার তাকিয়ে লালি উড়াল দিয়ে পাশের বাড়ির তিন তলার ছাদে গিয়ে পড়লো। বেচারা খোকার বাবা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর মনোকষ্টে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

খুব সংকোচ নিয়ে স্ত্রীকে বললেন

-লালি উড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে পরেছে।

-হায়! এখন খোকাকে কী বলবে?

একটা হট্টগোলের মধ্যে খোকার ঘুম ভাঙলো। সে দৌড়ে ছাদে চলে গেলো এবং লালিকে খুঁজতে লাগলো। ততক্ষণে লালি আবার উড়াল দিয়ে চারটি বাড়ির পরে একটি বাড়ির চার তলায় ছাদে গিয়ে পড়লো। মুরগির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে বাবা-ছেলের তিনদিন অতিবাহিত হলো এবং নিরাশ হয়ে তারা লালির আশা ছেড়ে দিলো।

সেদিন খোকা তার বিছানার উপরে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছে । হঠাৎ এক চিৎকার দিয়ে মাকে ডাকতে শুরু করলো। ছেলের চিৎকার শুনে মা দৌড়ে গেলেন। আঙুলের ইশারায় পাশের বাড়ির ছাদে লালিকে

দেখালো খোকা। মা তো অবাক! এত দূরে চলে যাওয়া মুরগি কখনো ফিরে আসে? কিছু চাল এনে জানালা দিয়ে পাশের ছাদে ছুঁড়ে মারলেন তিনি। অমনি কোথা থেকে এক কাক এসে চাল খেতে শুরু করলো। কাকটিকে হায় হায় করে তাড়ানোর ব্যবস্থা হলেও সেখানে হাজির হলো এলাকার হুলোবিড়াল। লালি এক লাফে পাশের বাড়ির আমগাছের মগডালে উঠে গেল। মুরগি ধরার অপেক্ষায় হুলো ছাদেই ঘুমিয়ে পড়লো। বিকেল নাগাদ লালিকে ছাদে নেমে খাবার খেতে দেখা গেলো। আবার হুলো ফিরে এলে লালি গাছে চড়ে বসে। এমনি করে কাটতে থাকে বেশ কিছুদিন ।

ঈদের দিন খোকার বন্ধু আরিফ এল বেড়াতে। আরিফকে দেখা মাত্রই লালি কক্ - কক্ শব্দ করে উড়ে এসে তার হাতের উপর পড়লো। খোকা তো অবাক! একি কাণ্ড ?

আরিফের মা শখ করে বারান্দায় কয়েকটা মুরগি পুষতেন। ছোটো থেকে বড়ো করা মুরগির মাঝে আরিফ এই লাল মুরগিটাকে একটু বেশি আদর করতো। আরিফের সাথে স্কুলে যেতে আসতে খোকাকে সে দেখেছে এবং চিনে ফেলেছে। আদরের মুরগিগুলো কয়েকদিন আগে চুরি হয়ে যায় এবং বাজার ঘুরে খোকার হাতে এসে পরে।

...সব ঘটনা শোনার পর খোকা আরিফকে মুরগিটা ঈদ উপহার হিসেবে দিয়ে দিলো। এবং মাঝে মাঝে আরিফের বাসায় গিয়ে লালিকে দেখে আদর করে আসে। লালি যেমন আরিফের আদর খেতে পছন্দ করে তেমনি খোকারও। একটি লাল মুরগিকে কেন্দ্র করে খোকার ও আরিফের বন্ধুত্ব আরো মজবুত হলো। সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলো খোকা ও আরিফের লালির গল্প। অতঃপর বন্ধুরা সবাই দলবেধে লালিকে দেখতে এল। ❑

গল্পকার

গল্প

ব্যাঙ ও পুঁটি

মুহাম্মদ নূর ইসলাম

অনেক বছর আগের কথা, তখন রেললাইনের একপাশে ছিল ঘন কাশবন আর অপর পাশে ছিল সবুজের ঢেউ খেলানো বিশাল ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল ছোট্ট একটি পুকুর। ওই পুকুরে বাস করত একঝাঁক পুঁটি আর একজোড়া ব্যাঙ। বর্ষার পানি কমে যাওয়ায় ব্যাঙ ও পুঁটিগুলো আটকা পড়ে পুকুরে, তারপর সেখানেই থেকে যায় তারা। অনেক দিন একসাথে থাকায় মাছ ও ব্যাঙের মধ্যে গড়ে ওঠে ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ফলে তাদের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয় 'পরবর্তী বর্ষা না আসা পর্যন্ত কেউ কারো কোনো ক্ষতি করবে না এবং সবাই একসাথে মিলেমিশে থাকবে।' চুক্তি মোতাবেক মাছ ও ব্যাঙ নির্ভয়ে বসবাস করতে লাগলো পুকুরে। কয়েকদিন পর স্ত্রী ব্যাঙ পুকুরের এক কোণে শ্যাওলা ধরা ঘাসের উপর ডিম পাড়ল, সেই খুশিতে পুরুষ ব্যাঙটি ঘাসের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা মশা, মাছি আর ছোটো ছোটো পোকা ধরে পুকুরের সবাইকে পেট ভরে খাওয়ালো। পুকুরে থাকা কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, সবাই ব্যাঙের জন্য দোয়া করল। একমাস পূর্ণ না হতেই ব্যাঙের ঘরে জন্ম নিল অসংখ্য ব্যাঙাচি। ব্যাঙাচিগুলো ব্যাঙের ছানা হলেও তারা দেখতে অনেকটা মাছের পোনার মতো লেজ ও পাখনাওয়ালা।

প্রথমদিকে ব্যাঙাচিরা একসাথে দলবেধে পুকুরের কোল ঘেঁষে ঘুরে বেড়াত। তারপর মাছের দেখাদেখি ডুবসাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। ছোটো ছোটো জলপোকা শিকার করা শিখল। এভাবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই ব্যাঙাচির শরীরে পরিবর্তন এল, তাদের হাত ও পা গজালো এবং মাছের পোনার মতো লম্বা লেজটি খসে পড়ল। ধীরে ধীরে ব্যাঙাচিরা ব্যাঙাচি থেকে সত্যিকার ব্যাঙে পরিণত হলো।

পুকুরে ব্যাঙের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুঁটিগুলো নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগল। ব্যাঙগুলো পুকুরের ছোটো ছোটো পোকা খেয়ে পুঁটিদের খাদ্য সংকটে ফেলে দিলো। এমনকি ব্যাঙদের কারণে পুকুরে ঠিকমতো সাঁতার কাটতেও বাধার সম্মুখীন হলো। চৈত্রের কড়া রোদে পুকুরের পানি শুকিয়ে যখন একদম তলানিতে ঠেকে গেল তখন পুঁটিগুলো পড়ল

আরো বিপদে! দিনের বেলা পুকুরের গরম পানিতে সাঁতার কাটতে তাদের হাঁসফাঁস ধরে গেলো কিন্তু ব্যাঙদের কিছুই হলো না। কারণ ব্যাঙগুলো দিনের বেলা আশ্রয় নিতো গাছের ছায়ায়, যখন তৃষ্ণা পেতো তখন উপর থেকে লাফ দিয়ে পানিতে নেমে সাঁতার কাটতো আর ডুব দিয়ে পানি খেত।

খরায় পুকুরের পানি কমে যখন একদম শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম তখন কয়েকটি যুবক ব্যাঙ একত্রে বুদ্ধি আটলো। তারা পুঁটিদের উদ্দেশে বলল 'তোমরা সবসময় পানিতে সাঁতার কেটে পানি ঘোলা করো, তোমাদের কারণে আমরা বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারি না। তোমরা যদি পানি ঘোলা করা বন্ধ না করো তাহলে আমরা তোমাদের শাস্তি দিব।' ব্যাঙদের চোখ রাঙানি দেখে একঝাঁক মুরুব্বি পুঁটি গিয়ে বড়ো ব্যাঙের কাছে নালিশ করল কিন্তু কোনো কাজই হলো না। বরং বড়ো ব্যাঙ পূর্বের শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে পুঁটিদের উপর আক্রমণ করলো, আত্মরক্ষার জন্য পুঁটিগুলো শিরদাঁড়ার পাখনা খাঁড়া করে ব্যাঙের মুখে আঘাত করল ফলে ব্যাঙের গালের চামড়া ছিঁড়ে গেল। বড়ো ব্যাঙের এরকম অপমান সহ্য করতে না পেরে যুবক ব্যাঙগুলো চারপাশ থেকে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং একে একে মাছগুলোকে ধরে খেয়ে ফেললো। ব্যাঙদের এরকম অমানবিক আচরণে পুকুরে থাকা কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক সবাই ব্যাঙদের তীব্র নিন্দা জানালো এবং অভিশাপ দিলো।

তার কয়েকদিন পরেই পানির সন্ধানে কাশবন থেকে এল একটি বিষাক্ত সাপ। সাপটি পুকুরে নেমে যখন পানি খেতে লাগল তখন যুবক ব্যাঙগুলো পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পানি ঘোলা করতে লাগলো। তৃষ্ণার্ত সাপটি তখন প্রচণ্ড রেগে গেল এবং ব্যাঙদের কামড়াতে লাগল কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাঙগুলো বিষক্রিয়ায় নীল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মারা গেল। ❑

গল্পকার

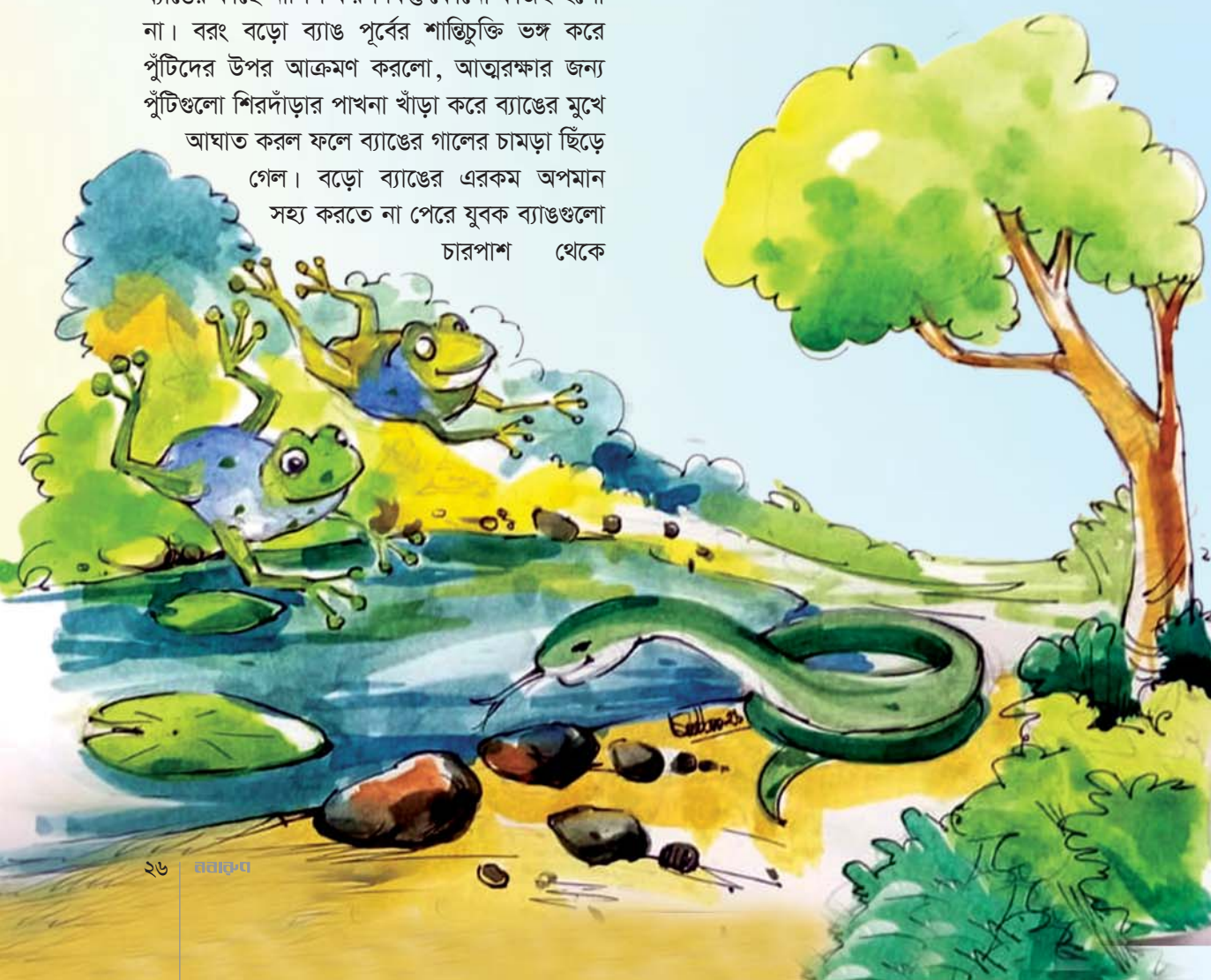

হাতি ও সিংহ

কামরুল হাছান মাসুক

আমরা সবাই জানি বনের রাজা সিংহ। কিন্তু বনের রাজা সিংহ কীভাবে হলো সেটা আমরা অনেকেই জানি না। আজকে বনের রাজা সিংহ হওয়ার গল্পটা শুনাবো।

সে অনেক আগের কথা। তখনো মানুষ পৃথিবীতে আসেনি। সারা পৃথিবী রাজত্ব করে বেড়াত হাতি। হাতিদের অনেক শক্তি ছিল। সংখ্যায় ছিল তারা অনেক বেশি। বনের সব পশুপাখি হাতিকে ভয় পেত। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিল যে, হাতিই বনের রাজা। হাতিদের তাণ্ডবে অন্য পশুপাখিরা ভয়ে তটস্থ থাকত। হাতিদের পাল দেখলেই যার যার গর্তে লুকিয়ে যেত। হাতিরা তাদের পাল নিয়ে চলাচল করত। তারা একা একা কখনো চলাচল করতে যেত না। তারা খুব দ্রুত চিতাবাঘের মতো দৌড়াতে পারে। অনেকেই মনে করে যে, হাতি মনে হয় খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে না। এটা কিন্তু সত্য না। এখনো হাতি খুব দ্রুত দৌড়াতে পারে। মানুষ হাতির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় কখনো পারবে না।

সিংহ চালাক প্রাণী। সে গর্তে বসে বসে চিন্তা করে হাতি কলাগাছ খায়। লতাপাতা খায়। তার দেহে শক্তি আছে। বিশালদেহী তার সাইজ। শুধু সাইজ

দিয়েই সে বনের রাজা হতে পারে না। তাকে শায়েস্তা করতে হবে। সিংহ শুরু করল গর্জন। সিংহের গর্জনে বনের সবাই ভয় পেল। হাতি ভয় পেল না। সিংহ গর্জন করতেই থাকে। সকাল- বিকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি সে গর্জন করতে করতে তার গর্ত থেকে বের হয়। সামনে যাকে পেত তাকেই ধরে খেয়ে ফেলত। তার গর্জনে বনের সবাই তাকে সমীহ করে চলত। সিংহ লতাপাতার মধ্যে থাকলেও সে কখনো লতাপাতা খেত না। সে ছিল মাংসাশী। সে মাংস খেতে পছন্দ করত। তাই গর্ত থেকে বের হয়েই সে প্রাণী খুঁজত। যাকে সামনে পেত তাকেই শিকার করত। অন্য পশুপাখিরা কেউ সহজে সিংহদের সামনে পড়তে চাইত না। তারা ঘুমাতে যেত সিংহের ভয়ে। তাদের সকাল হত সিংহের গর্জনে। অন্য পশুপাখিরা তাদের ছেলে-মেয়েদের নসিহত করত যেন তারা কখনো সিংহের সামনে না পড়ে। তার সামনে পড়লেই তাদের জীবন চলে যাবে। বনের বেশিরভাগ পশুপাখির বাচ্চাকাচ্চা বড়ো হতে থাকে সিংহের ভয় শুনে। সিংহ দেখলেই তারা আড়ালে লুকিয়ে যেত।

এদিকে বনের রাজা হাতি কাউকে কিছু করত না। তারা দলবেধে চলাফেরা করত। কাউকে ভয় দেখাতো না। গর্জন করত না। কলাগাছ, লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করত। অন্য পশুপাখিরা হাতিকে ভয় পেত না। তার সামনে দিয়েই সবাই চলাচল করত। কেউ কেউ হাতির সাথে মজাও করত। বানর হাতির পিঠে গুঁতা দিত। হাতি তার বিশাল শরীরের কারণে খুব সহজেই পিছনে ফিরতে পারত না। সে বানরকে কোনোভাবেই ধরতে পারত না। অন্য পশুপাখিরা হাতির কাণ্ড দেখে হাসত। তাকে নিয়ে মজা করত।

সিংহ হাতির কাণ্ড দেখে অবাক হয়। সে চিন্তা করে বানরের মতো নিরীহ প্রাণী বনের রাজাকে নিয়ে মজা করে। এটা কোনো কথা হলো। এত দুর্বল একটা প্রাণীকে কেন বনের রাজা হিসেবে মেনে নিব। এটা মেনে নেওয়া যায় না। হাতি কোনোভাবেই বনের রাজা হতে পারে না। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সিংহ সকল পশুপাখিদের নিয়ে বৈঠক ডাকল। বৈঠকে কেউ যোগ দিল না। বনের সকলেই সিংহকে ভয় পায়। সে সামনে যাকে পায় তাকেই খেয়ে ফেলে। বনের অন্যরা সিংহের ডাকে সাড়া দিল না। সিংহ এতে মনোঃক্ষুণ্ন হলো। কোনো উপায় না পেয়ে হাতির কাছে গেল সিংহ। হাতি সিংহকে দেখে ভয় পেল না। হাতি জানে সে বিশালদেহী। তার কিছুই সিংহ করতে পারবে না। সিংহ হাতিকে বলে, তুমি বনের রাজা কীভাবে হও? তুমি এক বানরের সাথেই পারো না। বানর তোমাকে কি নাচনটাই না নাচায়। তুমি বনের দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দাও। দেখো, বানরকে আমি কী করি।

হাতি বানরের অত্যাচারে অতিষ্ট। সে চিন্তা করে কথা সত্যি। বানর আসলেই পাজি। বানর শুধুমাত্র হাতির সাথে মজা করে। ওরা এত দ্রুতগতিতে কাজগুলো করে যে, হাতির পক্ষে বানরকে ধরা সহজ হয় না। পিছন দিকে ঢিল মারে। খামচি দেয়। গুঁতা মারে। শত চেষ্টা করেও হাতি বানরদের ধরতে পারে না। এটা নিয়ে হাতিরা অস্বস্তিতে আছে। সিংহের কথায় হাতি খুব খুশি হয়। হাতি সিংহকে বলে, তুমি যা বলেছ তা ঠিক আছে। বানর আমাদের জ্বালায়। এদের অত্যাচারে অন্যদের কাছে আমরা হাসির পাত্র হই। ওকে শায়েস্তা করতেই হবে। হাতি সিংহকে বলে, বানরকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য হলেও বনের রাজার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে আমরা ইচ্ছুক। সিংহ বলে, ঠিক আছে। বানরকে আমরা উচিত শিক্ষা দিব। বনের রাজার দায়িত্ব আমরা নিয়ে নিলাম। তোমরা বনের কোনো বিষয়ে নাক গলাতে পারবে না। আমরা যা করি তা তোমাকে মানতে হবে। এরপর থেকেই বনের রাজার দায়িত্ব চলে যায় সিংহের কাছে। সিংহ হাতিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখে না। তারা বানরের শায়েস্তা করে না। সিংহ চিন্তা করে বানরকে শায়েস্তা করলে হাতির কোনো দুর্বল দিক থাকবে না। এতে করে আবারও যে-কোনো সময় বনের রাজার ক্ষমতা সে ছিনিয়ে নিতে পারে। এরপর থেকে বনের রাজা হিসেবে সিংহকেই মূল্যায়ন করা হয়। ❑

গল্পকার

গল্প

জাদুর কলম

মিলাদ হোসেন সুজন

খুব সাজানো-গোছানো পরিপাটি ছোট্ট একটি গ্রাম ফুলিদের। তবে গ্রামটি শহর থেকে অনেক দূরে। ফুলি তার বাবা-মা আর দাদুকে নিয়ে এই ছোট্ট গ্রামটিতে থাকে। বাড়ির পাশেই একটি প্রাথমিক স্কুল, ফুলি সেই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। দস্যি একটা মেয়ে ফুলি, পড়াশোনার প্রতি তার একটুও মনোযোগ নেই। টইটই

করে পুরো গ্রাম মাথায় তুলে রাখে। আমগাছ, জাম গাছ বেয়ে বেড়ানোই তার নিত্যদিনের কাজ। ফুলির একটাই দুঃখ, স্কুলে তার কোনো বন্ধু নেই। কেউ তার পাশে বসতে চায় না, সবাই তার থেকে দূরে দূরে থাকে। আর তার একটাই কারণ ফুলি পড়াশোনায় অমনোযোগী। সে ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেখে না। হোমওয়ার্ক করে না। প্রতিদিন স্যারদের বকুনি খায়। কেউ মাঝেমধ্যে ফুলির পাশে বসলেও তার পাল্লায় পড়ে পড়াশোনা সব গোল্লায় যায়, আর স্যারের বকুনি খেয়ে তার সঙ্গ ছাড়ে। ফুলি ভীষণ দুঃখ পায়।

প্রতিদিনের মতো ফুলি স্কুলে যায়, আজ স্কুলে তাদের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ হলো। সবাই রেজাল্ট পেয়ে আনন্দ করতে ব্যস্ত থাকলেও ফুলি ক্লাসের এক কোনায় বসে কান্না করছে। কারণ সে দুই বিষয়ে খারাপ করেছে। তার দাদু তাকে বলেছিলেন সে যদি অর্ধ-বার্ষিক পরিক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে তাহলে তাকে একটি জাদুর কলম উপহার দিবেন। সেই জাদুর কলম দিয়ে লিখলে ফুলি ক্লাসের সবার সেরা হয়ে উঠবে। জাদুর কলম ডেকে ডেকে তার কাছে সকল বন্ধুদের নিয়ে আসবে। কেউ আর তার থেকে দূরে দূরে থাকবে না।

দাদুই ফুলির একমাত্র বন্ধু যিনি ফুলির সমস্ত কথা শুনেন। আজ রেজাল্ট খারাপ এই কথা শুনলে দাদু কষ্ট পাবেন ভেবে ফুলি আর বাসায় ফিরতে চায় না। স্কুল ছুটি হয়ে যায়। সবাই বাড়ি চলে গেলেও ফুলি স্কুলের পেছনের কাঁঠাল গাছের নিচে বসে কান্না করতে থাকে। ফুলির বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে ফুলির দাদু তাকে খুঁজতে বের হোন। খুঁজতে খুঁজতে স্কুল মাঠে এসে দেখেন ফুলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দাদুকে ফুলি দেখতে পেয়েই জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। দাদু বুঝতে পারেন ফুলির কান্নার কারণ। তারপর ফুলির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পকেট থেকে একটি কালো কলম বের করে দেন ফুলিকে। দিয়ে বলেন, এটাই হচ্ছে জাদুর কলম। বলেছিলাম তোমার রেজাল্ট ভালো হলেই দিবো। কিন্তু এখন আগেই দিলাম যাতে তোমার বার্ষিক পরিক্ষার রেজাল্ট সবচেয়ে ভালো হয়। ফুলি কলম পেয়ে আত্মহারা। চোখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করে- দাদু এই কলম কি আমাকে বন্ধু এনে দিবে? ক্লাসের পড়া শিখিয়ে দিবে? সবাই আমার সাথে খেলতে আসবে?

দাদু বলেন, এই কলমের অনেক জাদু। যদি তুমি তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করো তাহলে তুমি যা চাইবে তাই দিবে। এই কলম আজকে রাতে তোমার বইয়ের ভেতর রাখবে। কালকে ঘুম থেকে উঠে কলমের সাথে একটা চিরকুট দেখতে পাবে। এই কলম রাতে জেগে উঠে কাগজে লিখে রাখবে। চিরকুটের লেখাগুলো তুমি মেনে চললেই তুমি যা চাইবে তাই পাবে।

ফুলি আনন্দে উৎফুল্ল। কলম পেয়ে সে খারাপ রেজাল্ট এর কথা ভুলে গেছে। রাতে ফুলি কলমকে বইয়ের ভেতর রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে ঘুম ভাঙতেই ফুলি কলম দেখতে যায়। গিয়ে দেখতে পায় কলমের পাশে ভাঁজ করা একটা চিরকুট। সেখানে লেখা-

সময়কে অপচয় করো না।
ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখো।
হোমওয়ার্কগুলো প্রতিদিন করো।
গুরুজনের কথা মনে চলো।

ফুলি চিরকুট সব সময় সাথে রাখে। আগের মতো সময় অপচয় না করে পড়তে থাকে। ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শিখতে থাকে। হোমওয়ার্কগুলো প্রতিদিন করতে থাকে। আস্তে আস্তে ফুলির বন্ধু হয়। ফুলির পাশে বাসার জন্য অনেকেই আসে। খেলাধুলার জন্য সবাই ডাকে। ধীরে ধীরে ফুলি সবার প্রিয় বন্ধু হয়ে যায়। ক্লাসের স্যারেরা ফুলিকে অনেক আদর করে।

ফুলির অগোছালো দিন কেটে যায়। এক সময় ফুলির বার্ষিক পরিক্ষা চলে আসে। ফুলি নির্ভয়ে বার্ষিক পরিক্ষা দেয়। পরিক্ষা শেষে রেজাল্ট প্রকাশ হলে দেখা যায় ফুলি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। আজ ফুলির খুশি দেখে কে? ফুলি আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি যায়। বইয়ের ভেতর থেকে কলমটি বের করে দাদুর কাছে যায়। দাদুসহ পরিবারের সবাই ফুলির খুশিতে বেশ আনন্দিত। দাদুকে গিয়ে কলমটি ধরিয়ে দিয়ে বলে-

ধন্যবাদ দাদু
কলম তো কলমই শুধু
আমি হলাম আসল জাদু। ❑

গল্পকার

গল্প

গরম পিঠা

আল আমিন মুহাম্মাদ

কার্তিকে আমন পাকে। ফড়িং-পাখিরা মিষ্টি মিষ্টি রোদে খেলা করে সোনালি ঢেউয়ে। মাঝে মাঝে চাষি ভাই ক্ষেত ঘুরে দেখে আসে কবে ধান কাটবে।

সিনহা তার আব্বুর সাথে ধানের ক্ষেত দেখতে এসেছে। পাকা ধানের সুগন্ধে দুই বাপ-বেটার মন খুশিতে ভরে উঠেছে। সিনহা বলল, আব্বু আমাদের ধান কাটবে কবে?

কালই ধানে পোঁছ দেবো। বাড়ি গিয়ে কামলা ঠিক করতে হবে, চল।

সিনহা তার আব্বুর হাত ধরে বলল, হুম চলো।

চলতে চলতে সিনহা বলল, আব্বু ধান কাটা হলে এবার কিন্তু আমাকে সাইকেল কিনে দিতে হবে। স্কুলের ব্যাগটাও ছিঁড়ে গেছে।

সিরাজ মিয়া মুখে হাসি মেখে বলল, আচ্ছা বাবা ধান কাটা হলে সব হবে।

পরদিন ধান কাটতে সিনহাও গেল তার আব্বুর সাথে। দুজন কামলা মনের সুখে গান গাইছে আর ধান কাটছে। সিনহা খুব মুগ্ধ হয়ে ওদের সাথে ধান কাটতে লাগল। বেলাও হয়েছে খানিক। গামছায় মুড়ে সকালের ভাত নিয়ে এসেছে সিনহার আম্মু জাহিদা বেগম। সবাই হাত-মুখ ধুয়ে আলের সবুজ পিড়েয় বসে গেল ভাত খেতে।

খাবার মুখে দিয়ে সিনহা তার আম্মুকে বলল, আম্মু উঠোনের চুলাটা ভালো করে লেপেপুঁছে রেখেছ তো? কদিন পরেই কিন্তু পিঠাপুলি বানাতে হবে।

আম্মু সিনহার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, রেখেছি বাবা রেখেছি, তুমি খাও তো। আর খেয়েদেয়ে আমার সাথে বাড়ি চলো স্কুলে যেতে হবে। তোমার আর ধান কাটতে হবে না।

সিনহা বলল, না! না! আমি আরো কাটব।

তখন সিনহার আব্বু জাহিদা বেগমকে বলল, স্কুলে যাবার জন্য বিশ টাকা নয়, আজ আমার আব্বুকে চল্লিশ টাকা দেবে কিন্তু।

যাও বাবা স্কুলে। মাথায় খানিকটা হাত বুলালো সিরাজ মিয়া।

সিনহা তার আব্বুর সাথে ধানের আঁটি বোঝাই করে করে বাড়ি আনল। মাড়াইয়ের কাজটাও করল আম্মুর সাথে। গোলা ভরে ধান তুলল। এগুলো করতে সিনহার আব্বু নিষেধ করলেও সে শুনেনি। বলল, আমি গাঁয়ের ছেলে, এসব না করলে কি হয়! তাছাড়া তোমাদের খাটনি দেখলে আমার খুব মায়া হয়। আমি বড়ো হলে তোমাদেরকে কাজ করতে দেবো না। আমি চাকরি করব, তোমরা বসে বসে খাবা। ছেলের এমন কথায় সিরাজ মিয়ার দিল ভরে ওঠে।

গোলগাল চাঁদ। সন্ধ্যের পর আঙিনাটা জোছনায় টইটুম্বুর। ডালিম গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোছনারা খেলছে। তার পাশেই চুলো, পিঠে বানাতে বসেছে জাহিদা বেগম। চুলোর পিঠে মাদুর পেতে বই নিয়ে বসেছে সিনহা। পিঠে খাওয়ার জন্য ব্যাকুল তার মন। কিন্তু আম্মু বলেছে, অল্প একটু অপেক্ষা করলেই হবে।

সিনহা মহানন্দে বই পড়তে শুরু করল। একটু পর হঠাৎ সাইকেলের কিড়িং কিড়িং বেজে উঠল। সিনহার আব্বু এসেছে হাট থেকে, ধান বেচতে গিয়েছিল। বই রেখে দৌড়ে কাছে চলে গেল সিনহা। ব্যাগ থেকে এনে সবকিছু বের করল। সিনহার জন্য নতুন জামা-প্যান্ট, মায়ের জন্য রঙিন শাড়ি। দাদির জন্য জায়নামাজের পাটি ও তসবি। বড়ো রুই মাছ, আর মণ্ডা মিঠাই তো আছেই।

খানিক মিঠাই নিয়ে সিনহা তার দাদিকে দিয়ে আসলো। সিরাজ মিয়াও হাত-মুখ ধুয়ে চুলোর পিঠে গিয়ে বসল।

সিনহা মিঠাই খেতে খেতে আব্বুকে বলল, আব্বু, আমার সাইকেল আর ব্যাগ কবে দেবে?

এই তো আব্বু, কালই শহরে যাব। সবকিছু দেবো, কিন্তু লেখাপড়া ঠিকমতো করতে হবে যে।

সিনহা শুনে খুশিতে আটখানা হয়ে গেল। বলল, আচ্ছা আব্বু। ক্লাসের ফার্স্ট বয় আমি কাউকে হতে দেবো না।

ততক্ষণে কিছু পিঠা হয়ে গেল। সাথে সাথে জাহিদা বেগম দুই বাপ-বেটাকে এক থালে বেড়ে দিলো। পিঠার সুগন্ধ সিনহার খুশি খুশি মনটাকে আরো ভরে দিল। গরম গরম পিঠা নিয়ে হাসিমুখে খাচ্ছে! এমন হাসিমুখ দেখে সিরাজ মিয়া ও জাহিদা বেগম যেন এই মুহূর্তে পৃথিবীর সেরা সুখী মানুষ। ❑

শিশুসাহিত্যিক

জুলকারনাইন প্রাচুর্য, সপ্তম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অবুঝ মেয়ে

ইজামুল হক

মিসেস শায়লা জামান শক্ত ধাঁচের মানুষ। অল্পে ভেঙে পড়েন না তিনি। যে-কোনো সমস্যা-সংকটে নিজেকে স্থির রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে জানেন। ঢাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এক্সিকিউটিভ হিসেবে কর্মরত। সেখানেও তার দক্ষতার সুনাম রয়েছে। চাকরি এবং নিজ পরিবারের দেখাশোনা তিনি একাই সামলে নিতে পারেন। সংসারে কার কখন কী প্রয়োজন, কে কীভাবে চলছে – সেসব বিষয়েও তিনি কনসাস।

তবে এবার তাকে একটু বিচলিত মনে হচ্ছে। সমস্যাটা ছোটো মেয়ে মিতুকে নিয়ে। মিসেস জামানের দুই মেয়ে। বড়ো মেয়ে ঋতু চুপচাপ স্বভাবের। কথা কম বলে। আত্মীয়স্বজন কেউ এলে শুধু সালাম দিয়েই চলে যায় নিজের ঘরে। ছোটো মেয়ে মিতু তার উলটো। চঞ্চল ও উচ্ছল স্বভাবের। কলিং বেলের শব্দ হলেই দরজার দিকে দৌঁড়ে যায়। মা এলে তাকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে আসে। আজ কোনো শিক্ষক ক্লাসে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে, কে কার টিফিন খেয়ে ফেলেছে, বাসন ধুতে গিয়ে বুয়া আজ কী ভেঙেছে – সবকিছু এক এক করে মাকে বলতে থাকে। অপরিচিত

আত্মীয়স্বজন কেউ এলে তার পরিচয় জেনে সম্পর্ক বুঝে তার সাথে আলাপ-আপ্যায়নে ওর কোনো জুরি নেই। নানারকম গল্পগুজবে যে কাউকে মাতিয়ে রাখতে পারে সারাক্ষণ।

সেই চঞ্চল-উচ্ছল মেয়েটি আজ কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। কলিং বেল বাজলেও আগের মতো দৌঁড়ে যায় না। কারো সাথে তেমন কথাও বলে না। একা একাই থাকতে চায়। প্রাইভেট টিউটর আনিসও একদিন জানালেন –

– আন্টি, একটা কথা বলব?

– ওহ, হ্যাঁ। তোমার স্যালারিটা তো ...

মিসেস জামানের কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আনিস আবার বলতে শুরু করে –

– না, ওসব কিছু না। আমি মিতুর প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

– বেশ তো, বলো।

– আন্টি আপনি লক্ষ করেছেন কী-না জানি নে, কয়েকদিন হয় ওর মধ্যে একটা পরিবর্ত দেখছি। হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেছে। কথা কম বলে। পড়ার মাঝে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

– তুমি ঠিকই বলেছ। আমিও এটা দেখেছি।

শায়লা এবার মেয়ের সাথেও কথা বলে।

– তোর কী হয়েছে মিতু?

– কই, কিছু হয়নি তো।

– আমার কাছে লুকোসনে মিতু। সব খুলে বল। মায়ের কাছে কিছু লুকোতে নেই।

মিতু মনে মনে বলে, তোমাকে জানিয়ে কী লাভ। তুমি কী আর সত্যিটা বলবে?

মেয়ের কাছ থেকে কিছু জানতে না পেরে তার অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। না, জামানকে সে এখুনি কিছু জানাতে চায় না। জামান ভিতু স্বভাবের মানুষ। কোনো সমস্যার কথা শুনলে এমনভাবে ভেঙে পড়েন – তখন তাকে সামলাতেই হিমশিম খেতে হয়। যা কিছু করার সে নিজেই করবে।

মিতুর মা এবার ওর বান্ধবীদের সাথে আলাপ করবে বলে ঠিক করে। ওদের কারো সাথে কোনো সমস্যা হয়েছে কী-না? বা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে ওরা তা জানে কী-না।

না, এবারও কিছু জানতে পারে না। ওরা সকলেই জানায়, ওদের কারো সাথেই মিতুর কোনো ঝামেলা হয়নি। অন্য কোনো সমস্যার কথাও ওরা জানে না। তবে কয়েকদিন হয় ওকে অন্যমনস্ক লাগছে।

হ্যাঁ, এজন্যই তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা মিতুর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তোমরা চেষ্টা করলে ভেতরের কথাটা জানতে পারবে। কিছু একটা জানতে পারলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। ব্যাপারটা আমার মোটেও ভালো লাগছে না।

এবার মিতুর ক্লাস টিচারের সাথে আলাপ করতে যায় মিতুর মা। অনুমতি নিয়ে রুমে ঢুকে নিজের পরিচয় দেয়। ক্লাস টিচার নুসরাত জাহান অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে মিসেস জামানকে স্বাগত জানিয়ে বসতে বলেন। এরপর খানিকটা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন –

– ভালোই হলো। আপনি নিজেই এসেছেন। না হয় আমরাই আপনাকে খবর পাঠাতাম।

ক্লাস টিচারের এমন মন্তব্যে বড়ো কোনো সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে কিনা এমন ভাবনার ছাপ মিসেস শায়লা জামানের অবয়ব জুড়ে। নুসরাত জাহান তাকে আশ্বস্ত করে বলেন,

– আপনি এতটা উদ্বিগ্ন হবেন না। আমরা ওর মধ্যে এক ধরনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে আপনাকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেছি মাত্র। যাতে ওর সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আসলে ওদের বয়সি ছেলে-মেয়েরা সবকিছু আবেগ দিয়ে বিচার করে তো তাই ওদের নিয়ে ভয়টা একটু বেশি।

ড্রইং রুমের সোফায় বসে মিতু। কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। একটা কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে যেন। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে। নিজেকে একটু অন্যমনস্ক

করার জন্য সেন্টার টেবিল থেকে রিমোটটা তুলে টিভি অন করে। রাত আটটার খবর চলছিল তখন। শেষের দিকের একটা প্রতিবেদনে চমকে ওঠে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে প্রতিবেদনটি। যার শিরোনাম ছিল এরকম– 'পঞ্চাশ বছর পর সোহাগী ফিরে পেলো তার মা আলেয়াকে'। বিস্তারিত হচ্ছে এরকম– মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকসেনারা আরো অনেকের সাথে সোহাগীর বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধু হত্যাকাণ্ডই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুরো গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু আলেয়ার চোখে-মুখে তখনো আতঙ্কের ছাপ। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে। কীভাবে বাঁচাবে মেয়েকে। সব তো শেষ করে দিয়ে গেছে হানাদার পাকবাহিনী। এমন সময় গ্রামের এক স্কুল মাস্টারের সহযোগিতায় নেদারল্যান্ডের এক নিঃসন্তান দম্পত্তির হাতে তুলে দেয় মেয়ে সোহাগীকে। সেখানেই বড়ো হতে থাকে সোহাগী। তার বর্তমান মা-বাবা তার নাম রাখেন লুসি। এ নামেই তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। লুসি এক সময় জানতে পারে ওর আসল পরিচয়। এরপর বাংলাদেশে এসে স্থানীয় অনেকের সহযোগিতায় ফিরে পায় তার মাকে।

মা-মেয়ের এমন মিলন দৃশ্য মিতুকে এতটাই আবেগাপ্লুত করে, যে-চোখের জলে ওর বুক ভেসে গেছে টেরই পায়নি।

এ প্রতিবেদন মিতুকে চোখের জলে ভাসালেও অনেকটা সাহসী করে তোলে। ও ভাবে, পঞ্চাশ বছর পর সোহাগী যদি তার মাকে খুঁজে পায় তাহলে সে কেন মাত্র আট বছর আগে হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পাবে না? সোহাগী যদি সুদূর নেদারল্যান্ড থেকে মাকে খুঁজতে বাংলাদেশে আসতে পারে তাহলে সে কেন শরিয়তপুরের সোনাকান্দি গ্রামে যেতে পারবে না।

সোনাকান্দি তাকে যেতেই হবে। তবে কীভাবে যাবে এটা নিয়েই এখন ওর ভাবনা। মাথায় একটা বুদ্ধিও এসে যায়। আগামীকাল স্কুলে বান্ধবীদের সাথে আলাপ করে জানতে হবে শরিয়তপুরের কেউ আছে কি-না।

পরদিন টিফিন পিরিয়ডের সময় আলাপ করতেই একজন ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে পাওয়া গেলো যার গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুর। তবে গ্রাম সোনাকান্দি না। কিন্তু সোনাকান্দি সে চেনে। ওই গ্রামের পাশ দিয়েই যেতে হয় ওদের গ্রামে।

মিতুর জীবনের করুণ কাহিনি বান্ধবীদের এতটাই আবেগাপ্লুত করে– তারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করে যত ঝুঁকিই থাকুক না কেন এ ব্যাপারে মিতুকে ওরা সাহায্য করবে। সকলে মিলে ঠিক করে ফেলে কবে, কখন, কীভাবে তারা সোনাকান্দি গ্রামে যাবে।

আগামীকাল খুব ভোরে রওনা দেবে সোনাকান্দি। কোথা থেকে যাত্রা শুরু হবে, কোথায় গিয়ে নামতে হবে – সবকিছু ঠিকঠাক। তাই তাড়াতাড়ি ঘুমুতে চায় মিতু। কিন্তু ঘুম আসে না। মাকে ফিরে পেলে আনন্দ হবে ঠিকই। কিন্তু এতকাল যাকে মা বলে জেনেছে তাকে ছেড়ে কী থাকতে পারবে। তবুও সে জানতে চায় মায়ের আদর কেমন হয়, শরীরের গন্ধটাই বা কেমন। এসব ভাবতে ভাবতেই একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরিকল্পনা মতো রওনা হয়ে যায় ওরা। বেলা ১২টার মধ্যেই পৌঁছে যায় সোনাকান্দি। পোশাক আর কথাবার্তায় গ্রামের মানুষ কৌতূহলী হয়ে ওদের কাছে জানতে চায়– তোমরা কি শহর থেকে এসেছ? কোন বাড়ি যাবে? এ সুযোগটা কাজে লাগাতে চায় মিতু– বলে, এ গ্রামের মরিয়মকে আপনি চেনেন কি? আজ থেকে আট বছর আগে ঢাকায় যার মেয়ে হারিয়ে যায়। আমরা তার সাথে দেখা করতে এসেছি।

মিতুর কথায় অবাক হয় মানুষটি। বলে, এ গ্রামে তিনজন মরিয়ম আছে। একজনের এখনো বিয়ে হয়নি। দ্বিতীয়জনের কোনো ছেলেপুলে জন্মায়নি। তৃতীয় জনের দুই ছেলে। তারা শহরে থাকে। তোমাদের বোধহয় কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে।

মিতু এবার উলটো বলে,

– আপনার তো কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না।

– দেখো মা, আমি এ গ্রামেরই মানুষ। একজন স্কুল মাস্টার। মানুষ কেন – এ গ্রামের কোনো বাড়িতে

ক'টা কুকুর-বেড়াল আছে তাও আমার জানা। আমি আবারও বলছি, তোমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। তোমরা অহেতুক কষ্ট না করে ফিরে যাও। এবার ওরা বুঝতে পারে হয়ত কোথাও একটা ভুল হয়েছে। ঢাকার পথে রওনা হয় ওরা।

বিকেল পাঁচটা পার হয়ে যাচ্ছে। মিতু এখনো ফিরছে না। গভীর আশঙ্কায় ডুবে যেতে থাকে মিতুর মা। নিজেকে শক্ত রেখে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করতে চেষ্টা করে। প্রথমেই ফোন করে মিতুর বান্ধবী সিধুর বাসায়। অপর প্রান্ত থেকে সিধুর মা বলে, কে? শায়লা আপা? কুশল বিনিময় না করেই সরাসরি জানতে চায়, আপা মিতু কি আপনাদের ওখানে? ও তো এখনো বাসায় ফিরেনি।

– না আপা, মিতু আমাদের এখানে আসেনি। আসবে কেমন করে। আমার মেয়ে সিধুও এখনো ফিরেনি।

হতাশ হয়েই ফোন রাখতে হলো। একটা অজানা আশঙ্কায় শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসতে চায় মিসেস জামানের। নানারকম দুঃশ্চিন্তা তাকে গ্রাস করে ফেলছে – মেয়েটা কী এক্সিডেন্ট করলো? নাকি অপহরণকারীদের হাতে পরলো। না, এভাবে ভেঙে পরলে চলবে না। থানায় জিডি করতে হবে। হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিতে হবে। নিজেই নিজেকে সাহসী করে তুলতে চায় সে। মনে হয়, এ মুহূর্তে কেউ একজন পাশে থাকলে ভালো হতো। আর সে মানুষটি যদি হয় এজাজ – তাহলে ভরসার জায়গাটা অনেক বেড়ে যায়।

এজাজ মিতুর ছোটো চাচা। মিতুকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। মিতুও ছোটো চাচা বলতে অস্থির। চাচাও তাই একটু সময় পেলেই ছুটে আসে মিতুর কাছে। যতক্ষণ থাকে, মিতুর সাথে খুনসুটিতে কেটে যায় সময়। নানারকম কথা বলে মিতুকে খ্যাপাতে চায়। ওকে খ্যাপিয়ে তোলাই যেন এজাজের আনন্দ। মিতু যত বেশি খ্যাপে এজাজ ততই আনন্দ পায়। মিতুকে ভালোবাসে শুধু এ কারণেই নয়। এজাজের পরিচিত অনেকেই অনেক বড়ো বড়ো জায়গায় বসে আছে। এ মুহূর্তে তারা অনেক কিছুই করতে পারে। সময় নষ্ট

করতে চায় না মিসেস শায়লা। ব্যাগ থেকে মোবাইল সেটটি বের করে এজাজকে কল করে। ওপাশ থেকে এজাজের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ ভেসে আসে–

– হ্যাঁ ভাবি, বলো।

শায়লা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। এজাজ অস্থির কণ্ঠে জানতে চায়–

– হ্যালো ভাবি, কথা বলছ না কেন! কী হয়েছে।

শায়লা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে,

–এজাজ আমার খুব বিপদ। মিতুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি কী এক্ষুণি একবার আমার এখানে আসতে পারবে? আমার মাথায় কোনো কাজ করছে না।

– আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি কোনো চিন্তা করো না। মিতুর কিছু হয়নি। আমি ওকে খুঁজে আনবই।

অল্প সময়ের মধ্যেই এজাজ এসে উপস্থিত হয়। এজাজকে দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারে না শায়লা। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

– আমার মিতুর কী হলো এজাজ!

– কিছুই হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যে মিতু ফিরে আসবে।

– আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না এজাজ। চলো, থানা আর হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নেই।

এজাজ দৃঢ় কণ্ঠে বলে–

– কোথাও যেতে হবে না। আমি কোনো মিথ্যে সান্ত্বনাও দিচ্ছি না। সবকিছু জেনেশুনেই বলছি। তোমাদের এই অবস্থার জন্য আমিই দায়ী। না বুঝে তোমাদের অনেক বড়ো ক্ষতি করে ফেলেছি।

শায়লা কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু বিস্ময়ভরা চোখে এজাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। এজাজ পুরো বিষয়টা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করে –

– শোনো ভাবি, আমি শেষবার যেদিন তোমাদের এখানে আসি তখন তুমি আমাকে বসতে বলে কিচেনে চলে গেলে। এরপর মিতু এসে আমাকে বললো, চাচু চাচু আজ তোমাকে একটা বিচার করতে হবে। আমি জানতে চাইলাম, কার বিচার। বিচারের বিষয় কী। মিতু অভিমানের সুরে বলতে শুরু করলো – আমি ঋতু আপুর টেবিল থেকে না বলে একটি কলম এনেছিলাম। ঋতু আপু অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমার টেবিলে এসে কলমটা দেখতে পেয়ে আমাকে খুব বকাঝকা করে। আমি আম্মুর কাছে বলতে গেলে আম্মু আপুকে কিছু না বলে উলটো আমাকে বলে – তুই না বলে ওর কলম এনেছিস কেন? আমি মিতুকে খ্যাপিয়ে তোলার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলাম। ওকে বললাম, তোকেই তো বকা দেবে। তুই তো তার আসল মেয়ে না। তোকে তো কুড়িয়ে পেয়েছে। এটা শুনে মিতু আমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। আমি আবার বলি, তোর বয়স যখন পাঁচ তখন তুই তোর মায়ের সাথে ঢাকায় এসে হারিয়ে যাস। মাকে হারিয়ে তুই যখন কান্নাকাটি করছিলি তখন তোকে দেখে শায়লা ভাবির খুব মায়া হলে তোকে সাথে করে নিয়ে আসে। তখন থেকেই তুই এখানে আছিস। তোদের গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুরের সোনাকান্দি গ্রাম। তোর মায়ের নাম মরিয়ম। ভাবি, আমি খুব বড়ো ভুল করে ফেলেছি। বুঝতে পারিনি মিতু এতটা রিঅ্যাক্ট করবে। তুমি আমাকে যে শাস্তি দেবে দাও।

– জেনেশুনে মিতুর কোনো ক্ষতি তুমি করতে পারো এটা আমি ভাবতেও পারি না। আমাকে শুধু বলো, মিতু এখন কোথায়।

– মিতু ওর বান্ধবীদের নিয়ে সোনাকান্দি গ্রামে গিয়েছিলো আমার মুখ থেকে শোনা কল্পিত মায়ের খোঁজে। এখন ওরা ঢাকার পথে।

– তুমি এসব জানলে কী করে।

– তাহলে শোনো। তোমার কাছ থেকে যখন জানলাম মিতুকে পাওয়া যাচ্ছে না – তখনি আমি বুঝতে পেরেছি আমার কথাকে সত্য ভেবে সেই সত্যের সন্ধানে সোনাকান্দি গ্রামে গিয়েছে মিতু। ওই গ্রামে আমার এক কলেজ বন্ধু এখন স্কুল মাস্টার। আমি ওকে ফোন দিয়ে সবকিছু জানিয়ে জানতে চেয়েছিলাম;

ওখানে এমন কোনো মেয়েকে দেখেছে কী না। বন্ধুটি বলে, তাহলে তুই-ই সেই নাটের গুরু। ওরা তো আমার কাছেই এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল। আমি বলে দিয়েছি – এ গ্রামে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। এরপর ওরা ঢাকার দিকে রওনা করেছে।

এজাজের কথা শেষ না হতেই মিতুকে দেখে সবাই সেদিকে দৌড়ে যায়। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে শায়লা বলে, তুই এমন একটা কথা কী করে বিশ্বাস করতে পারলি। মিতু ফুঁপিয়ে ওঠে। মা, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

ধুর পাগলি, তুই ফিরে এসেছিস এটাই বড়ো কথা।

এজাজ অপরাধীর মতো এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। মিতুকে জড়িয়ে ধরে আদর করার সাহসটুকও যেন আজ তার নেই। শায়লা এজাজের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে মিতুকে বলে,

– যাও, চাচ্চুর কাছে যাও।

মিতুকে জড়িয়ে ধরে এজাজ বলে,

– তুই কী আমার মিথ্যেটাকে এখনো ...

মিতু বুঝতে পারে – এজাজ চাচা কী জানতে চায়। মিতু বলে –

– না, মাস্টার সাহেব আমার সব ভুল ভেঙে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, যার একটি মেয়ে আছে সে কখনো আরেকটি মেয়েকে পালক আনবে না। তাছাড়া ওখানে এমন কোনো ঘটনা নেই।

মিতুর হারিয়ে যাবার ঘটনায় এতক্ষণে এ বাড়িতে অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছেন। এদের একজন মনোবিজ্ঞানী। এজাজকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, – এজাজ সাহেব, আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে এত বড়ো ভুল কী করে করলেন? আমি মিলাতে পারছি না। মা-বাবাকে না জানিয়ে মিতুর শরিয়তপুর যাওয়াটা ঠিক হয়নি। তবে ওখানে গিয়ে সত্যটা না জানলে মিতুর অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যেতে পারতো। ❑

গল্পকার

ফাহমিদা নবী প্রভা, পঞ্চম শ্রেণি, জগতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলগাজী, ফেনী

গল্প

পারি

তাহমিদ হাসান

-রমু, জানালা বন্ধ করে দে। বৃষ্টির পানি ঘরে ঢুকবে।

-দিচ্ছি আম্মা।

বিকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে; কিন্তু থামার কোনো নাম বা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না; অথচ এখন প্রায় রাত আটটা। এদিকে বৃষ্টি বাড়ার সাথে সাথে কারেন্টও চলে গেছে। জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির রিমঝিম গান শুনতে বেশ ভালো লাগছিল রমুর। কিন্তু আম্মার কথা অমান্য করে যদি জানালা খোলা রাখে সে এবং যদি ঘরে বৃষ্টির পানি ঢোকে, তবে আম্মার হাতের কানমলা তো খেতেই হবে, আর যদি আম্মার মেজাজ বেশি খারাপ থাকে, তখন একটু বেশিই বকা খেতে হবে। অথচ সে খেয়াল করে দেখেছে, কোনো কথা না শুনলে, অথবা অন্যায় করলে মা-বাবা কখনও শান্তা আপুকে বেশি বকা দেয় না; খুব বেশি হলে একটু রাগারাগি করে আর কি। শান্তা রমুর বড়ো বোন, এ বছর সে ঢাকা ভার্সিটিতে

সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়েছে।

রমুরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর আট তলায় থাকে। তাদের বিল্ডিং এর সামনে বড়ো রাস্তা ডান দিক থেকে বামে চলে গেছে; আর তাদের ফ্ল্যাটটা রাস্তার দিকে মুখ করা বিধায় তাদের ঘরে আলো-বাতাসের কোনো অভাব নেই; ঢাকা শহরে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকারি। আবার সামনের ব্যালকনিতে বসে খোলা আকাশ দেখতে রমুর খুব ভালো লাগে। জানালা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে রমু। তেমন কিছু করার নেই, বিছানায় শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করছে সে। হঠাৎ জানালায় মানুষের মতো টোকা দেবার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল রমু। কিন্তু সে আরও বিস্মিত হলো, যখন তার নাম ধরে একটি কিশোরী কণ্ঠ মিনতি জানালো, রমু, জানালাটা কি একটু খুলবে; আমি ভিতরে আসতে চাই।

যদিও রমু এখনও প্রায় শিশু, ক্লাস সিক্সে পড়ে।

বয়সের তুলনায় তার ভয় একটু কম, কিন্তু কৌতূহল অনেক বেশি। তার ছোট্ট এই জীবনে এর চেয়ে অবাক করা ঘটনা আর ঘটেনি। টেবিল ল্যাম্পের আবছা আলোয় এই বৃষ্টির রাতে জানালার ওপাশ থেকে একটা মেয়ে জানালা খোলার জন্য তার নাম ধরে অনুরোধ করছে-এটা কীভাবে সম্ভব! কিন্তু আবার যখন একই ভাবে তার নাম ধরে মেয়েটি ডাকলো, তখন সে আর তার কৌতূহল সামলে রাখতে পারলো না। ব্যাপারটা কী দেখার জন্য সে বিছানা থেকে নেমে জানলা খুলে দেখতে লাগলো, তাকে কে ডাকছে! রমু দেখলো তারই বয়সি কোঁকড়া চুলের অপরূপ একটা মেয়ে জানালার গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটিকে দেখে রমু যত না অবাক হলো, তার চাইতে বেশি অবাক হলো, এই আট তলার জানালায় সে আসলো কীভাবে-এই কথা ভেবে।

কে তুমি?

আমি পরি।

তোমার নাম কী?

আমার নাম রুকাইয়া।

তুমি আমার নাম জানলে কীভাবে?

তোমার আম্মা যখন তোমাকে জানালা বন্ধ করতে বলেছিল, তখন শুনেছি তোমার নাম রমু।

কিন্তু তুমি এখানে আসলে কীভাবে?

আমার আম্মা আমাকে এখানে রেখে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য হয়তবা আসতে দেরি করছে; এদিকে আমিও বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি, তাই ভাবলাম এই সময়টুকু তোমার সাথে বসে গল্প করে কাটিয়ে দেই; আম্মু আসলেই চলে যাবো। অবশ্য তুমি না চাইলেও আমি ভিতরে আসতে পারতাম, কিন্তু তুমি অনুমতি দিলে আমার ভালো লাগবে।

ঠিক আছে, তুমি ভিতরে আসতে পারো। কিন্তু তুমি আসবে কী করে? আর যদি তোমাকে আম্মু অথবা আপু দেখে ফেলে?

কোনো সমস্যা নেই রমু, আমি ভিতরে আসতে পারবো। আর তুমি চিন্তা করো না; আমি হচ্ছি পরি; আমি যাকে দর্শন দেবো শুধু সে-ই আমাকে দেখতে পাবে, অন্য কেউ নয়।

তবে তো মজাই হবে, ভিতরে আসো। রমু জানালা থেকে সরে দাঁড়িয়ে রুকাইয়াকে ভিতরে আসার জায়গা করে দিলো। কিন্তু সে দেখলো অনুকূল বাতাস পেয়ে ধোঁয়া যেভাবে ঘরে ঢোকে, ঠিক সেই ভাবে রুকাইয়া ধোঁয়ার মতো ঘরে ঢুকে আবার রুকাইয়া হয়ে গেলো।

আচ্ছা রুকাইয়া, তোমরা কি সব সময় আমাদের এখানে আসো?

সব সময় না, তবে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসি।

কেন?

কারণ, মানুষের কাজ কারবার দেখতে আমাদের ভালো লাগে।

আমার ঘরে আসলে কেন?

তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছিলে তাই। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলে, কেন তোমার আম্মা তোমার দুষ্টুমির কারণে রাগ হলে শুধু তোমাকেই বকে; অথচ তোমার শান্তা আপু কোনো

অন্যায় করলেও আম্মা তাকে তেমন বকে না।

তুমি কী করে বুঝলে? আমি এটাই ভাবছিলাম (রমু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল)।

বুঝলাম, কারণ আমরা চাইলে মানুষের মন পড়তে পারি; এমনকি আমরা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব দেখতে পারি। তাই তুমি যখন এসব ভাবছিলে, আমি তখন তোমার অতীত দেখছিলাম।

তা তুমি কী দেখতে পেলে?

তুমি শুধু তোমার মায়ের রাগটাই দেখতে পাও; রাগের আড়ালে মায়ের ভালোবাসা দেখার মতো ক্ষমতা এখনও তোমার হয়নি। তাই তুমি তোমার আম্মার কষ্ট দেখতে পাও না। তোমার আম্মা যখন কোনো কারণে তোমাকে বকেন, তখন তোমার মনে যত ব্যথা লাগে, তার শত গুন আঘাত লাগে তোমার আম্মার মনে। আর যেদিন এমন ঘটনা ঘটে, সেদিন রাতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তোমার আম্মা চুপিচুপি এসে তোমার মাথার কাছে বসে থাকে; এবং মনে মনে বলে, 'আহা, আমার অবুঝ রমু।'

তাই?

হ্যাঁ, অবশ্যই তাই। পৃথিবীতে মায়ের ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না।

কিন্তু শান্তা আপুও তো আমাকে বকে।

এটা কিছু না, বড়ো বোন একটু শাসন তো করবেনই।

আপু তার মোবাইলে আমাকে একটুও গেম খেলতে দেয় না।

ওহ, বেচারা রমু। তোমার তো অনেক দুঃখ। ঠিক আছে আমি তোমার দুঃখ কমানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার আপু এখন কী করছে জানো?

না, আমি কী করে জানবো। আমি তো তোমার সাথে বসে গল্প করছি।

তোমার আপু এখন তার প্রিয় বান্ধবী রোকসানার সাথে চ্যাট করছে। আগামীকাল ভার্সিটির ক্লাস শেষে তারা নীলক্ষেতে যাবে বই কিনতে, আর ফুচকা খেতে। এখন তুমি তোমার আপুর ঘরে যাও এবং বলো, 'আপু কাল তুমি কি রোকসানা আপুর সাথে নীলক্ষেতে ফুচকা খেতে যাবে? গেলে আমার জন্য একটু ফুচকা নিয়ে এসো।' ব্যাস, এইটুকু বলে দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবে, তোমার আপু জিজ্ঞাসা করবে, 'তুই কী করে জানলি, আমরা ফুচকা খেতে যাবো?' তুমি তখন বলবে, 'আমি আরও অনেক কিছু জানি।' এই

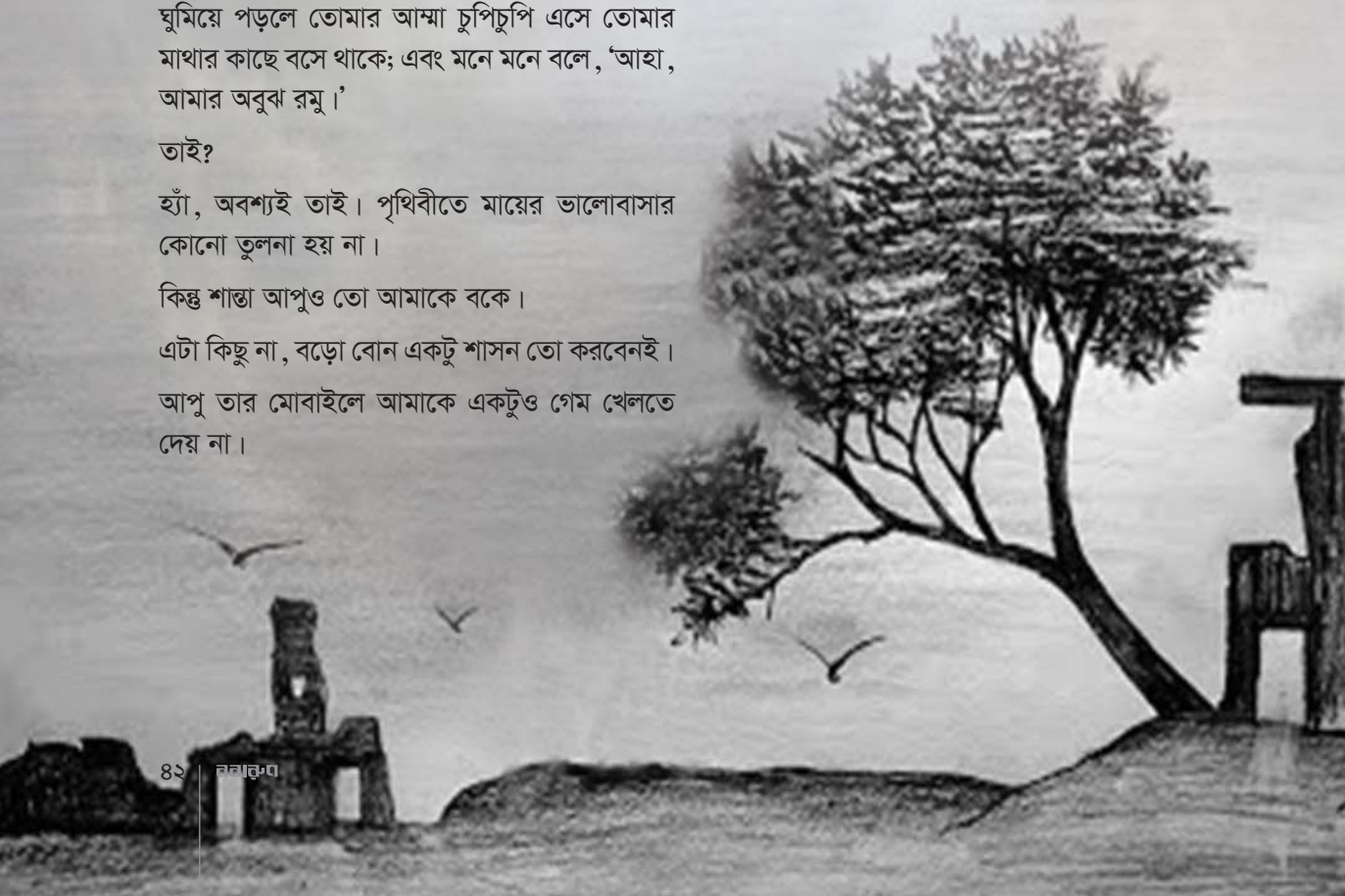

কথা বলে তুমি চলে আসবে। দেখবে কিছুক্ষণ পরে তোমার আপু এসে মোবাইল তোমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলবে, 'রমু, একা একা বসে আছিস; নে ভাই গেম খেল।' কিন্তু তুমি তখন বলবে, 'না আপু, এখন না, পরে খেলবো।' যাও, তোমার আপুর ঘরে যাও।

কিন্তু তুমি চলে যাবে না তো?

না, আমি যাব না। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে, এখন থেকে আমরা দুজনে বন্ধু।

ঠিক আছে, তুমি বসো। আমি আপুর ঘর থেকে ঘুরে আসছি।

রমু আপুর ঘরে গিয়ে দেখে, আপু শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছে। তার মানে রুকাইয়া ঠিকই বলেছে।

আপু আসবো?

আয় রমু।

আপু, তুমি কি কাল রোকসানা আপুর সাথে নীলক্ষেতে ফুচকা খেতে যাবে? গেলে আমার জন্য একটু ফুচকা নিয়ে এসো।

তুই কী করে জানলি, আমরা ফুচকা খেতে যাবো?

আমি আরও অনেক কিছু জানি। তুমি মনে হয় ব্যস্ত, আমি যাই।

রমু যেভাবে ঝড়ের বেগে এসেছিল, ঠিক একই রকম ঝড়ের বেগে আবার শান্তা আপুর ঘর থেকে চলেও গেলো। কিন্তু শান্তা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগলো -রমু তার মনের খবর জানলো কীভাবে?

রমু ঘরে এসে আনন্দে রুকাইয়ার সাথে হাই-ফাই করে, দুজনে হাসতে লাগলো। বোঝাই যাচ্ছে দুজনে খুব মজা পেয়েছে; আর বিশেষ করে শান্তা আপুকে অবাক করে দিতে পেরে রমুর খুশির কোনো সীমা নেই, তার হাসি থামছেই না। কিছুক্ষণ পরে রুকাইয়ার কথামতো শান্তা আপু রমুর ঘরে এসে বললেন, 'রমু, কী করছিস ভাই?'

আপু, কিছু না।

রমু একা একা বসে আছিস; নে ভাই গেম খেল। এই কথা বলে শান্তা তার মোবাইলটা রমুর দিকে এগিয়ে দিলো।

না আপু, এখন না, পরে খেলবো।

ঠিক আছে, তোর যখন গেম খেলতে মন চাইবে আমাকে বলিস। আমি এখন গেলাম।

ঠিক আছে আপু।

শান্তা আপু ঘর থেকে চলে গেলো। আর এক দফা হাসির জোয়ার উঠলো রমু ও রুকাইয়ার মধ্যে।

দেখলে রমু, তোমার আপু কিন্তু আমাকে দেখতে পায়নি।

তাই তো দেখলাম। জানো রুকাইয়া, এত মজা আমি জীবনেও পাইনি।

সে তো তোমাকে দেখেই আমি বুঝতে পারছি।

কিন্তু তুমি চলে গেলে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে তো? তুমি সাথে থাকলে আমি অনেক মজা করতে পারবো।

ঠিক আছে, আমি তোমার কাছে আসবো, কথা দিলাম। তুমি যখনই মন থেকে আমাকে ডাকবে, আমি চলে আসবো। কিন্তু আমার দুইটা শর্ত আছে, এটা তোমাকে মানতে হবে; তুমি যদি এটা না মানো, অথবা শর্ত ভঙ্গ করো, তবে আমি আর কখনোই তোমার কাছে আসবো না।

না, না, রুকাইয়া আমি তোমার সব কথা মেনে চলব। কিন্তু শর্ত দুইটা কী, সেটা তো বলো।

তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। প্রথম শর্ত, আমাকে কোনো অন্যায় অনুরোধ করবে না। আর দ্বিতীয় শর্ত, আমার কথা তুমি কাউকেই প্রকাশ করতে পারবে না।

ঠিক আছে রুকাইয়া, আমি তোমার দুইটা শর্তই অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

গল্পে গল্পে দ্রুত সময় কেটে গেছে, কেউ খেয়াল করেনি। এখন রাত প্রায় সাড়ে নয়টা। এদিকে রমুর বাবার ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে; বাবা সাধারণত রাত দশটার মধ্যে বাসায় ফিরে আসেন। রমুর বাবা

সরকারি বড়ো কর্মকর্তা; সরকার থেকে তার বাবাকে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য একটি গাড়িও দিয়েছে; তাই শত ঝড়বৃষ্টির মাঝেও বাবার চলাচলে কোনো অসুবিধা হয় না। এদিকে বৃষ্টিও থেমে গেছে।

রমু, বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে; আর আমার মাও আমাকে নিতে আসছে। একটু পরেই আমাকে যেতে হবে।

তোমার আম্মা এখন কোথায়? আর তুমি কী করে বুঝলে যে তিনি তোমাকে নিতে আসছেন?

তোমার কথায় মজা পেলাম। আমি যদি তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দেখতে পারি; তবে আমারটা কেন দেখতে পারবো না! আমাদের অনুভূতি অনেক গভীর; তোমরা তা আন্দাজ করতে পারবা না। আর আমার আম্মা এখন কত দূরে আছে জানো?

না, কত দূরে?

তোমাদের পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ যত দূরে, আমার আম্মাও ঠিক তত দূরে। তুমি কি জানো, মঙ্গলগ্রহ কত দূরে?

হ্যাঁ, জানি। প্রায় ২৫ কোটি কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব মাঝে মাঝে বাড়ে এবং কমে। আমাদের ক্লাসে বিজ্ঞান স্যার পড়িয়েছেন।

বাহ, চমৎকার। তুমি তো খুব ভালো ছাত্র রমু। কিন্তু তুমি কি জানো, এই পথ পাড়ি দিতে তোমাদের তৈরি নভোযানের কতদিন লাগে?

হ্যাঁ, প্রায় নয় মাস থেকে এক বছর।

অসাধারণ। কিন্তু আমাদের কতদিন লাগে জানো?

না।

এই পথ আমরা তোমাদের চোখের পলকে পাড়ি দিতে পারি। কারণ আমাদের গতি অসীম, মানুষের মনের গতির চাইতেও দ্রুত। আমরা যদি কোথাও যেতে চাই, তবে মুহূর্তে আমরা সেখানে পৌঁছে যাই।

রমু অবাক হয়ে রুকাইয়ার কথা শুনতে লাগলো, আর মনে মনে ভাবতে লাগলো, সেও একদিন রুকাইয়ার সাথে মহাশূন্যে ঘুরতে যাবে।

কী ভাবছ রমু?

কিছু না।

আমি জানি, তুমি কী ভাবছো।

রমু তার মনের আকাঙ্ক্ষা রুকাইয়ার কাছে লুকাতে পারলো না, শুধু রুকাইয়ার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো।

ঠিক আছে, তোমাকেও আমি একদিন আমার সাথে ঘুরতে নিয়ে যাবো। কিন্তু চলো, জানালা খুলে দাও এখন আমাকে যেতে হবে। বাইরে তাকিয়ে দেখো আকাশে কোনো মেঘ নেই; আর কত সুন্দর একটা চাঁদ উঠেছে।

যদিও রুকাইয়াকে ছাড়তে রমুর মন চাইছিল না, কিন্তু ছাড়তে তো হবেই; তার আম্মা আসতেছে তাকে নিয়ে যেতে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোমড়া মুখে রমু জানালা খুলে দিল। রমুর এই মন খারাপ দেখে রুকাইয়ার খুব খারাপ লাগলো। আবার মানুষদের এই আবেগের জন্যেই মানুষ তার খুব ভালো লাগে।

রমু, মন খারাপ করছ কেন? আমি তো তোমাকে কথা দিয়েছি, তুমি ডাকলেই আমি আসব। বিদায় বেলায় মন খারাপ করে থেকো না রমু; আমাকে হাসি মুখে বিদায় জানাও।

ঠিক আছে রুকাইয়া, বিদায়। আবার দেখা হবে।

রমু জানালা খুলে দিলে রুকাইয়া চলে গেলো; আর রমু জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো- মেঘমুক্ত আকাশে সুন্দর একটা চাঁদ, যেন রমুর দিকে তাকিয়ে হাসছে। রমুর মন ভালো হয়ে গেলো। চাঁদের দিকে তাকিয়ে রমুর মনে হলো, রুপালী এই চাঁদ আসলেই চমৎকার। ❑

গল্পকার

নবান্নের পিঠা পায়েস

নবান্ন উৎসব বাঙালির হাজার বছরের পুরানো ঐতিহ্য। এই উৎসবে সবাই ধর্ম-বর্ণ ভুলে একসঙ্গে আনন্দ উদযাপন করে। এ সময় কৃষকরা ফসল ঘরে তোলার সময় নানা ধরনের অনুষ্ঠান বা উৎসব পালন আসছে। এই গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আনন্দের হলো নবান্ন উৎসব।

নবান্ন মানে নতুন ভাত বা নতুন খাবার। নতুন ধান কাটার পর সেই ধানের চাল দিয়ে প্রথম রান্না উপলক্ষে এই উৎসব হয়। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে যখন আমন ধান পাকে, তখনই এই উৎসব পালিত হয়। কার্তিক, অগ্রহায়ণ মাস মিলে হেমন্ত ঋতু। হেমন্তের প্রথম মাস পার হওয়ার পর ধান কাটার সময় কৃষকের ঘরে খুশির ঢল নামে। এসময়ে নতুন ধানের পিঠা-পায়েস খাওয়া,আর উৎসবের ধুম লেগে যায়। গ্রামের ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠে সবাই।

ঢাকায় নবান্ন উৎসব আনুষ্ঠানিকভাবে পালন শুরু হয় ১৯৯৮ সাল থেকে। প্রতিবছর পহেলা অগ্রহায়ণ ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে নবান্ন উৎসব আয়োজন করা হয়।

নবান্ন ও অন্যান্য গ্রামীণ উৎসব আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বড়ো অংশ। এগুলো শুধু উৎসব নয়, আমাদের কৃষি, অর্থনীতি ও গ্রামের প্রতি ভালোবাসার প্রতীক। এছাড়াও এই উৎসবগুলো আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

গল্প

অপারেশন থ্রি হিরোস

শাকিব হুসাইন

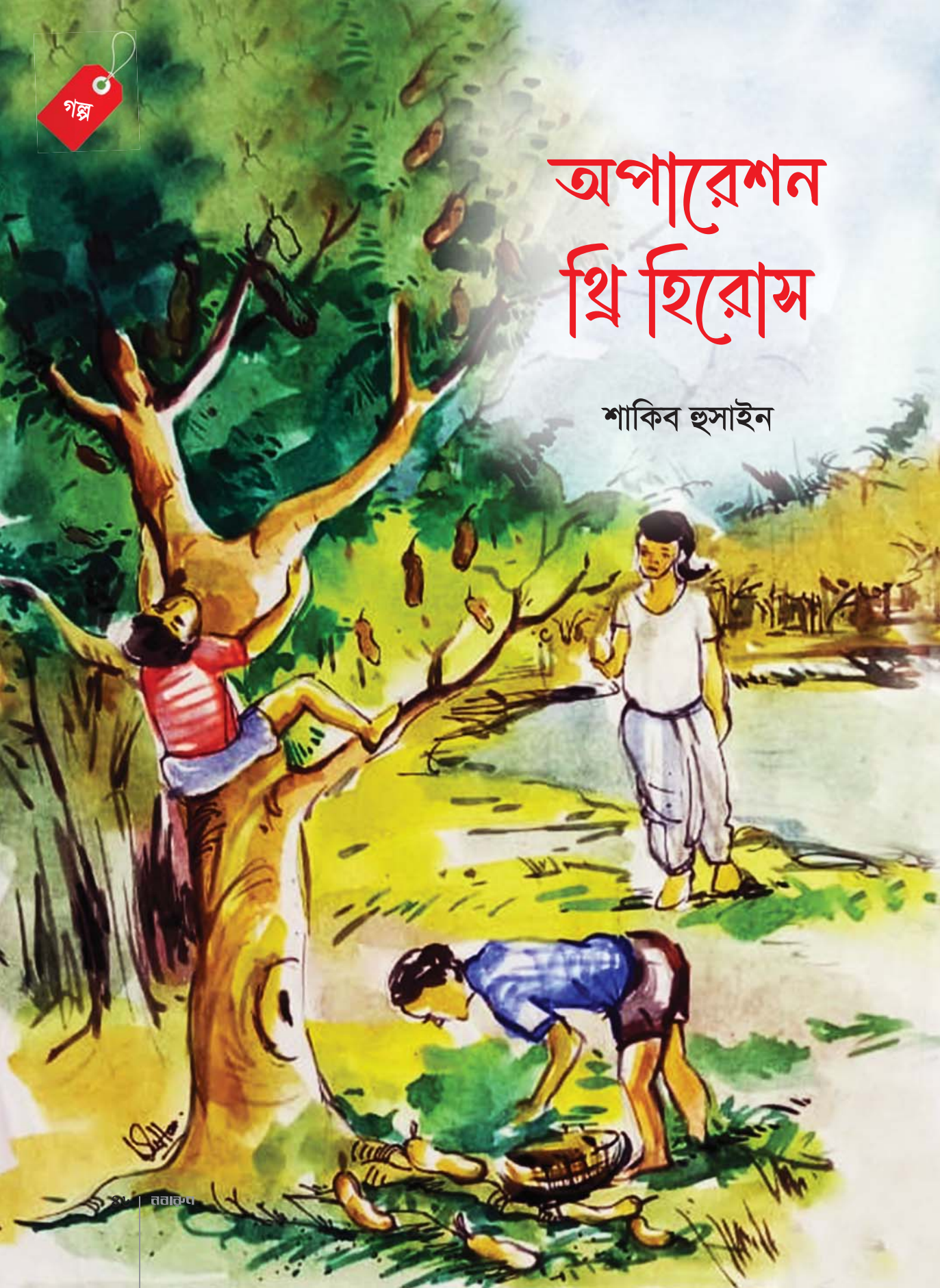

ক্লাস শেষ। ছুটির ঘণ্টা ঢংঢং করে বাজছে। সবাই বাড়ির দিকে ছুটছে কিন্তু তিনজন ছুটছে বটতলীর দিকে। তিনজন মানে বিনু, দিনু আর তিনু। তিনজনই সহপাঠী। ক্লাস নাইনের অর্ধ-বার্ষিক শেষ করেছে সবেমাত্র। ছুটির পর বটতলীর মাঠে ওদের আড্ডা জমে ওঠে রোজ। আজকেও তার ব্যতিক্রম না।

বটগাছের নিচে ধপাস করে তিনজন বসে পড়ল। বসতে না বসতেই দিনু বলে উঠল, আজকের ক্লাসটা দেড় ঘণ্টা নিলো স্যার!

'আর বলিস না, উনি যে ব্যাকরণ স্যার! ব্যাকরণের মারপ্যাঁচে ফেলে দেড় ঘণ্টা চটাং করে শেষ করে দিল!', বিনু বলল।

ওদের দুজনের কথা আটকিয়ে তিনু বলল, তোরা কি বলিস বল। আজকের ক্লাসটা অনেক সুন্দর ছিল। সমাস তো আমার পানি হয়ে গেছে।

'তুই তো ব্যাকরণের পণ্ডিত। তোর কাছে পানি হবে না তো আমাদের কাছে হবে?', দিনু বলল।

এবার বিনু বলল, তোরা থাম তো। এই কোনো না, জঙ্গলের ওদিকে তো অনেকদিন যাওয়া হয় না। পুরানা বাংলো বাড়িটার ওখানে আমগুলো পেকে টসটসে হয়েছে মনে হয়। যাবি নাকি একবার?

তিনু বলল, না বাবা! পুরানা বাংলো বাড়িতে বিষধর সাপ আছে। আমার ছোটো চাচ্চু সেদিন নাকি ইয়া বড়ো গোখরা সাপ দেখেছে। ওদিকে না যাওয়াই ভালো হবে।

'তুই বড্ড ভয় পাস তিনু। আমরা আছি না। গেলে চল, না গেলে সোজা বাড়ির পথ ধর', দিনু বলল।

বিনুও দিনুর মতো বলে উঠল, আমগুলো আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। চল না গেলে পরে আপসোস করবি।

তিনুও আর না করতে পারল না। আর বলল, তোদের ছাড়া কখনো একা একা বাড়ি গেছি কোনোদিন? চল আমিও যাব।

তিনজন গলা ধরে পুরানো বাংলো বাড়ির দিকে রওনা দিলো।

মনু পাগলা বটের ডালে বসে গান ধরেছে: পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না রে, পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না...

আমগুলো দেখেই বিনুর চোখজোড়া জ্বলজ্বল করতে লাগল। কী যে টসটসে হয়েছে! জ্বলজ্বল চোখ নিয়ে বিনু বলল, দ্যাখ দ্যাখ আমগুলো পেকে টসটসে হয়েছে রে।

'একবারে মুখ্য সময়ে এসেছি। ঢিল ছুড়বি, না গাছে উঠবি?', দিনু বলল।

'গাছেই উঠি চল।'

ওদের দুজনের এমন কাণ্ড দেখে তিনু বলে উঠল, ভরদুপুরে গাছে উঠিস না। ভূতটুত ধাক্কা দিতে পারে।

অমনি দিনুও বলে উঠল, ভূতকে তো আমরাই ধাক্কা দেবো রে। দেখলি না সেদিন কেমন করে পাঞ্জা লড়াইয়ে অমন মোটা হাবলুটাকে হারিয়ে দিলাম। আর আমারে কী না ভূত ধাক্কা দিবে হাহাহাহা! তোর ভয় আর গেলো না। আমরা গাছে উঠছি তুই আম কুড়া নিচে থেকে।

এই বলে বিনু আর দিনু কাঠবিড়ালির মতো তড়তড় করে আমগাছে উঠতে লাগল।

গাছ থেকে দিনু হাঁক ছেড়ে উঠল, এই তিনু কতগুলো আম হয়েছে রে?

'কুড়ি তিনেক তো হবেই।'

বিনু বলল, আর না পাড়ি রে দিনু। আর কয়েকদিন পর পাড়ি। এদিকে এমনিতেও তো কেউ আসে না। বাকি আমগুলো ভালো করে পাকুক।

'ঠিক বলেছিস। চল নেমে পড়ি।'

দুজনে আবার গাছ থেকে কাঠবিড়ালির মতো তড়তড় করে নামতে থাকল।

ওদের নামতে না নামতেই তিনু বলে উঠল, ব্যাগে আম ভরা যাবে না। আঠা লেগে যাবে।

'তুই তো আস্ত একটা বোকা রে। পড়াশোনা ছাড়া তোর মাথায় কিছু নাই!', বিনু বলল।

দিনু বলল, ওই যে ওখানে তাকিয়ে দ্যাখ কত্ত বড়ো বড়ো কচুপাতা। যা রে তিনু দু-তিনটা নিয়ে আয়।

তিনু কচুপাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ চোখ পড়ল বাংলো বাড়ির পেছনে। ঘটকাকে দেখতে পেল।

চুপিচুপি বিনু আর দিনুকে ডাক দিল।

তিনু বলল, ওইটা আমাদের ঘটকা না বিনু?

'দেখি দেখি। হ্যাঁ, আমাদের ঘটকাই তো।'

দিনু বলল, ওর সাথে বাকি দু'জন কারা? দেখতে কেমন জানি অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের! ওর হাতেই বা ওগুলো কী?

'গতকাল খবরে দেখেছি এভাবে ড্রাগস সাপ্লাইয়াররা

নাকি ড্রাগস সাপ্লাই করে', তিনু বিজ্ঞের মতো বলল।

বিনুও বলল,আমার তো তাই মনে হচ্ছে। দেখিস না ঘটকাটার মাথা সবসময় কেমন হট হয়ে থাকে। কারো সাথে ঠিকমতো মেশে না। চোখমুখ কেমন লাল লাল হয়ে থাকে।

'তার মানে ঘটকাই এলাকায় ড্রাগস সাপ্লাই করে। এলাকার ছেলেদের অধঃপতনের জন্য ঘটকাই দায়ী', দিনু বলল।

তিনু বলল, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। আর যদি হয় তাহলে এটা কখনোই হতে দেওয়া যায় না। আমাদের সবাইকে ড্রাগস থেকে রক্ষা করতে হবে।

তিনজনে দেখল ঘটকা ওদের কাছ থেকে প্যাকেটগুলো নিল। অদ্ভুত দু'জন একদিকে আর ঘটকা একদিকে পথ ধরল। তিনুরাও কিছুক্ষণ পর বাড়িতে চলে গেল।

মনু পাগলা কখন যে আমগাছের তলায় এসেছে কেউ জানে না। গান ধরেছে বড়ো গলায়:

সময় গেলে সাধন হবে না...

পরের দিন স্কুল ছুটির পর বিনু ঘটকাকে ডেকে বলল, এই ঘটকা একটু শুনবি?

'কি বলবি বল তাড়াতাড়ি। সময় মোটেও নাই।'

দিনু বলল, ক্যান কই যাবি?

'তোকে কেন বলব। কি বলবি বল তাড়াতাড়ি।'

তিনু বলল, তোর সাথে গতকাল জঙ্গলের বাংলো বাড়ির ওদিকে দু'জন কে ছিল?

'কে ছিল মানে?'

'মানে পরিষ্কার। তুই কি কোনো অন্যায় কাজের সাথে জড়িত আছিস?', দিনু বলল।

'মুখ সামলে কথা বল।'

হঠাৎ ঘটকা কেমন আমতা আমতা করতে থাকল। কিছু না বলেই তড়তড় করে চলে যেতে লাগল। বিনুরাও কিছুক্ষণ পর ঘটকার পিছু নিতে লাগল।

দেখতে দেখতে আবারও পুরানা বাংলো বাড়িতে এসে গেল তারা। ঘটকা আবারও দু'জন অজ্ঞাত ব্যক্তির সাথে কথা বলছে।

ঘটকা ভীষণ ভয়ে ভয়ে ওদের বলছে, এখানে আর ড্রাগস লেনদেন করা যাবে না।

একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বলল, কেন? এত গোপন জায়গা। সমস্যা কোথায়?

'আমার বন্ধুরা সব দেখে ফেলেছে। ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। এবার থেকে ওদিকটার পুরানা মন্দিরের কাছে দেখা হবে।'

আরেকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বলল, তোমার যা মন চায়। তবে ঠিকমতো কাজ হলেই হলো।

এতক্ষণ ধরে দিনুরা ঘটকাদের সব কথা চুপিচুপি শুনেছিল। এবার তারা সরাসরি দারোগাবাবুর কাছে।

'স্যার, আমরা তিনজন ড্রাগস সাপ্লাইয়ারকে নিজের চোখে দেখেছি। তার মধ্যে একজন আমাদের বন্ধু', তিনু বলল।

'বলো কি!'

দিনুও বলল, জ্বি স্যার, আমাদের বন্ধু ঘটকা এলাকায় ড্রাগস সাপ্লাই দেয়।

বিনু বলল, ওর জন্য এলাকার ছেলেগুলো অধঃপতনে যাচ্ছে। ওকে ধরুন স্যার।

'তোমরা চিন্তা করো না। একসাথে বাকি দু'জনকেও ধরতে হবে। ওদের চক্রটাকে ধরতে হবে। কোথায় দেখা করে ওরা?'

তিনু বলল, জঙ্গলের পুরানা বাংলো বাড়িতে। তবে আগামীকাল পুরানা মন্দিরের কাছে করবে।

দারোগাবাবু বলল, কালকে বুঝবে ড্রাগস সাপ্লাইয়ের ফল। আমরা কালকে একসাথে ওদের ধরব। কালকে হবে একটা অপারেশন। আচ্ছা বলো তো কি নাম দেওয়া যায় অপারেশনের?

'অপারেশন!', বিনু বিস্ময়ে বলে উঠল।

'হ্যাঁ অপারেশন।'

'তাহলে আপনিই ঠিক করে দিন স্যার', দিনু বলল।

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ইউরেকা পেয়েছি পেয়েছি। এই অপারেশনের নাম হবে 'অপারেশন থ্রি হিরোস'।

বিনু বলল, বাহ্ সুন্দর নাম তো। 'অপারেশন থ্রি হিরোস' কেন স্যার?

দারোগাবাবু বলল, কারণ এই অপারেশনের নায়ক তোমরা তিনজন। ড্রাগস সাপ্লাইয়াররা ধরা পড়লে পুরো অবদান তোমাদের।

পরের দিন পরিকল্পনা মাফিক বিনুরা দারোগাবাবুর সাথে এসে পুরানা মন্দিরের কাছে ঘাপটি মেরে বসে আছে। পুলিশের অন্যান্য সদস্যরাও চারদিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর ঘটকাসহ বাকি দু'জন এসে হাজির। কয়েক মিনিট পর দারোগাবাবু একটা ফাঁকা গুলি করে দারোগাবাবু কড়া গলায় বলে উঠল, এই কেউ পালাবি না। আজ তোদের খেল খতম।

তিনজনে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। ঘটকা আর একজনকে ধরে ফেলল পুলিশ সদস্যরা। বাকি একজনকে তিনুরা ধরে ফেলল।

দারোগাবাবু বলল, ড্রাগস সাপ্লাই করো ড্রাগস। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের টার্গেট করেছ না! এবার জেলে গিয়ে মরো বাছারা।

পরেরদিন স্কুলে তিনুদের খুব সুনাম করছে সবাই। স্কুল ছুটির পর বটতলীতে বসে তিনজনে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তাদের বীরত্বের খবর পড়ছে। প্রথম পাতায় বড়ো করে শিরোনাম তাদের খবর। 'অপারেশন থ্রি হিরোস'-এর মাধ্যমে ধরা পড়ল ড্রাগস সাপ্লাইয়াররা। তিনজনের চোখ আনন্দে টলমল করছে।

বটগাছের ডালে বসে মনু পাগলা গান ধরেছে: ধন্য ধন্য বলি তারে- ❑

গল্পকার

গল্প

মামা ও শিকারি

ইকবাল কবীর রনজু

শীতের দিনে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে অরিক। এ নিয়ে ওর মা জুলেখা খাতুন প্রায়শই চেঁচামেচি করে। মা চেঁচামেচি করলেও শিমুল তুলোয় ভরা লেপের ওমকে অগ্রাহ্য করতে পারে না অরিক। মা টেনেটুনে তোলার চেষ্টা করলেও উঠছি বলে আবার লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পরে। পড়ালেখায় চৌকষ হওয়ায় দেরিতে ঘুম থেকে উঠলেও বরাবরই পরীক্ষায় ভালো করে সে।

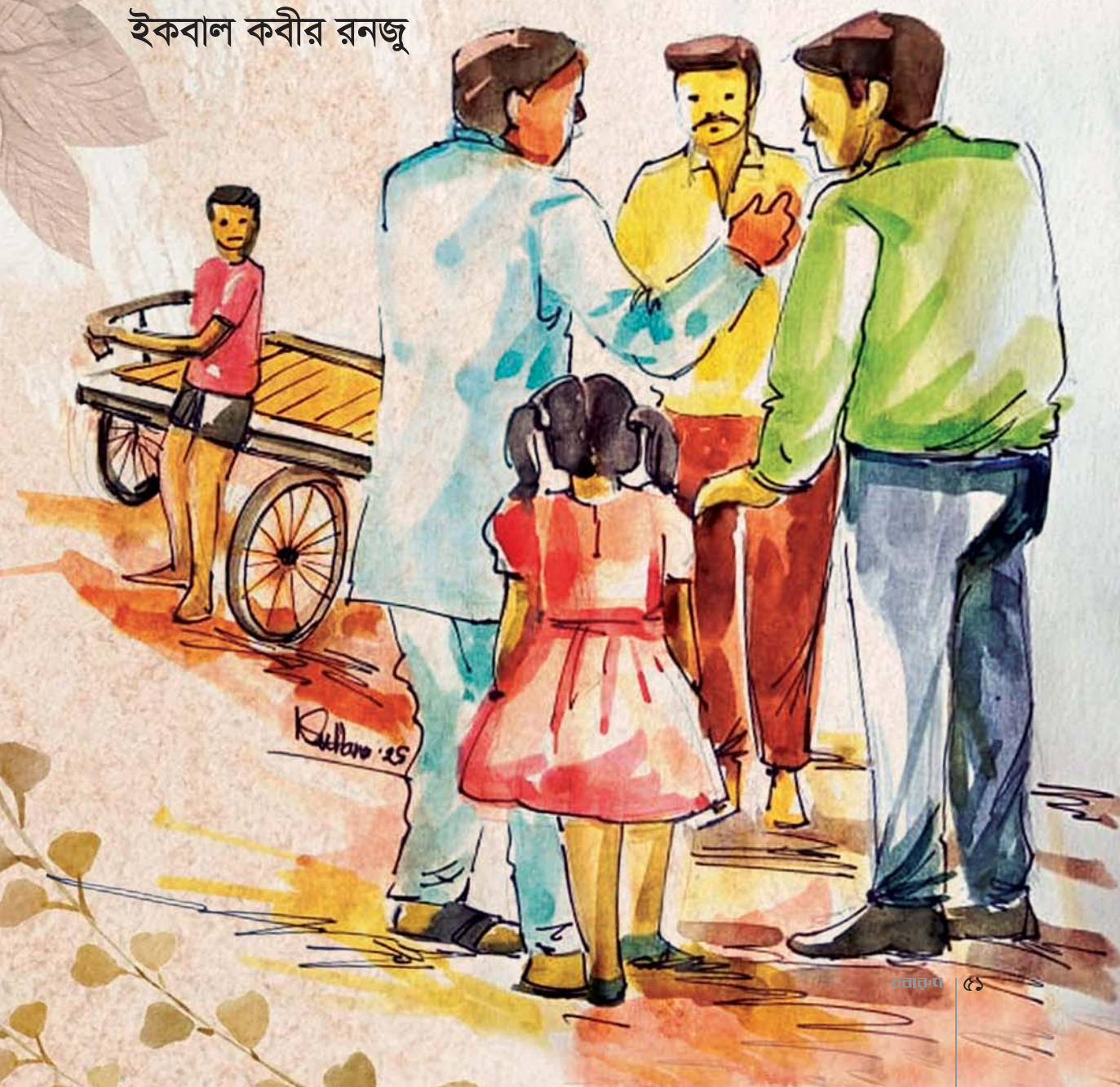

গ্রামের শেষ প্রান্তে খলশেগাড়ি বিলের খুব কাছাকাছি ওদের বাড়ি। বাড়ির পাশেই স্কুল। দশটায় ক্লাস শুরু হয়। সোয়া নয়টার দিকে হাই তুলতে তুলতে ঘুম থেকে ওঠে সে। তার ব্যাংকার বাবা ততক্ষণে ব্যাংকের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে। আড়মোড়া ভেঙে পোষা বিড়ালটার নরম তুলতুলে গায়ে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে আদর করে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র অরিক।

সেদিন স্কুলে যাবার সময় ধানকুনিয়া বাজারের কাছাকাছি পৌঁছুতেই দুই বক শিকারিকে বক বিক্রি করতে দেখে অরিক। ধূসর ও সাদা রঙের বকগুলোর লম্বা ধারালো ঠোঁট থ্যাঁতলে দিয়েছে শিকারিরা। খাওয়ার জন্য দুইশ টাকা জোড়া দরে বক কিনছে গ্রামের কিছু মানুষ। বকগুলো নিশ্চয়ই জবাই করে খাবে ওরা। রান্না করা বকের চিকন চিকন রান, লম্বা গলা কল্পনায় ভাবতেই তা দাগ কেটে যায় অরিকের কিশোর মনে। মানুষগুলো বকের হাড় চিবিয়ে-চিবিয়ে খাচ্ছে কল্পনায় মনের মধ্যে এমন দৃশ্যের অবতারণা হওয়ায় তার কিশোর মনে নেমে আসে বিষাদের ছায়া। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে পা চালায় স্কুলের পথে। ক্লাসে মন বসে না তার।

ছুটির পর বাড়ি ফিরে মাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলে না অরিক। বিকেল চারটার দিকে মা ঘুমিয়ে পড়লে মায়ের বালিশের কাছ থেকে চুপি চুপি স্মার্ট ফোনটি নিয়ে নিজের রুমে আসে সে। বক ধরার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তার কিছু ধারণা থাকলেও আরো বেশি জানার জন্য গুগলে সার্চ করে। কিছু আর্টিকেল পড়ে বক ধরার ক্ষতিকর প্রভাব ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে ধারণা পেয়ে অরিক মনে মনে ভাবতে থাকে বক শিকারিদের কী করে শায়েস্তা করা যায়। কিন্তু কেবল ভাবলে তো আর হবে না। কাজ করতে হবে। কী ভাবে কী করবে এমন নানা প্রশ্ন যখন ওর কিশোর মনকে আন্দোলিত করছিল তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। মা ও ঘর থেকে ফোন ধরতে বলে। ভয়ে ভয়ে ফোনটি নিয়ে মায়ের হাতে দিয়ে পাশে দাঁড়ায় অরিক।

অরিক বুঝতে পারে বড়ো মামার ফোন। বড়ো মামা তিন দিনের জন্য বেড়াতে আসছেন অরিকদের বাসায়। অরিক মনে মনে ভাবে যাক এবার একটা হিল্লে হলো। বড়ো মামা নামকরা সাংবাদিক। বার্ডস ক্লাবের সভাপতি। বড়ো মামাকে সব খুলে বললে নিশ্চয়ই এই তিন দিনের মধ্যে বক শিকারিদের শায়েস্তা করতে অরিককে সাহায্য করবেন।

ঘণ্টা খানেক পরেই বড়ো মামা বাসায় এলেন। অনেকদিন পর আসায় সবাই খুব খুশি। অরিক তো মহাখুশি। রাতে খাওয়াদাওয়া শেষে গল্প করে বড়ো মামা অরিকের ঘরে শুতে এলেন। অরিক চুপি চুপি বড়ো মামাকে সব খুলে বলল। বক শিকারিদের শায়েস্তা করতে বড়ো মামার সাহায্য চাইল। অরিকের কাছে সব শুনে বাহবা দিলেন মামা। আর ঠিক ছয়টায় মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখতে বললেন।

মামা অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছেন। তাই ঘুমিয়ে পরতে না পরতেই ঘরঘর করে নাক ডাকা শুরু হলো। অনেকক্ষণ পর অরিকের ঘুম এল বটে কিন্তু রাতের মধ্যে কয়েকবার জাগনা পেল সে। রাত যেন আর ফুরোয় না। ভোরবেলা বড়ো মামার ডাক কানে যেতে না যেতেই দ্রুত ঘুম থেকে উঠে বসে অরিক। বড়ো মামা তখন বাইরে বেরুনোর জন্য রেডি হচ্ছিলেন। অরিককেও দ্রুত রেডি হতে বললেন। মামা-ভাগ্নে দ্রুত বেড়িয়ে পড়ল বক শিকারিদের শায়েস্তা করতে।

বাইরে তখন ঘন কুয়াশা। বড়ো মামা অরিকের টুপিটা ঠিকঠাক করে দিলেন। দুজন হাঁটতে থাকলেন খলশেগাড়ি বিলের দিকে। বিলের মধ্যকার রাস্তার ঘন কুয়াশা ভেদ করে মাঝেমধ্যে ছুটে চলছে দু-চারটি গাড়ি। ধীরে ধীরে চারদিক ফরসা হতে থাকে।

পূর্বাকাশে উঁকি মারে টকটকে লাল সূর্য। রাস্তার দু'পাশের বোনা আমন ধান হলুদাভ হয়ে এসেছে। রাস্তার এপাশ-ওপাশের ধানক্ষেতের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুজনের। দেড়-দুই কিলোমিটারের মতো এগিয়ে যাবার পরও দেখা মিলল না শিকারিদের। অরিককে হতাশ হতে দেখে বড়ো মামা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। এরই মধ্যে সূর্যটা অনেকখানি উপরে উঠে গেছে। রাস্তায় লোকজন চলাচল শুরু হয়েছে।

মামা-ভাগনে ভগ্ন মনোরথে ফেরার সময় বোয়ালমারী ব্রিজ পার হতেই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভ্যান গাড়ির দিকে চোখ যায় অরিকের। দুজন লোক রাস্তার পাশে খালের পানিতে পা ধুচ্ছে। ভ্যান গাড়ির উপর দুটি পাটের বস্তার মধ্যে কি যেন নড়ছে। মামা, বস্তার মধ্যে কী নড়ছে অরিকের এমন প্রশ্নে মামার চোখও আটকে যায় ভ্যান গাড়িতে। ভ্যান গাড়ির উপর বাঁশের বানা, কলার পাতা, খেজুরের ডাগুড় আর বস্তার মধ্যে নড়তে থাকা কিছু একটা দেখে মামা নিশ্চিত হন নিশ্চয়ই এরা পাখি শিকারি।

পা ধুয়ে লোক দুজন ভ্যানের কাছে আসতেই অরিকের মনের মধ্যে টানটান উত্তেজনা শুরু হয়। চুপি চুপি বলে, মামা এ দুজন লোককেই কাল বক বিক্রি করতে দেখেছি। বড়ো মামা এবং অরিক এগিয়ে যায় ভ্যান গাড়িটির দিকে। মামা বক কিনতে চান। শিকারিরা বস্তার মুখ খুলে বক দেখায়। ধূসর ও সাদা রঙের বক। নিশ্চয়ই এবার কিছু একটা হবে ভাবে অরিক। বড়ো মামা তার ফোনটি বের করে ঝটপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেন। এরপর বড়ো মামা ভ্যান গাড়ির হ্যান্ডেলের সাথে লাগানো চাবিটি খুলে নিজের হাতে নিয়ে নেন। ছবি তোলায় এবং গাড়ির চাবি নিয়ে নেওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন শিকারিরা। তারা ততক্ষণে বুঝে যায় আজ যমের হাতে পড়েছে তারা। বেশ কিছু পথচারী তখন জটলা করেছে অরিকদের পাশে।

মামা শিকারিদের বক শিকারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বোঝান। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝান। বকগুলো মুক্ত আকাশে ছেড়ে দিতে বলেন। শিকারিরা আর বক শিকার করবে না বলে জানায়। তবে ধরা বকগুলো নিয়ে যেতে চায় তারা। বড়ো মামাও নাছোড়বান্দা। কোনোমতেই তাদের বকগুলো নিয়ে যেতে দিবেন না। শুরু হয় বাদানুবাদ। বড়ো মামা ভয় দেখান তাদের। শিকারিদের আলটিমেটাম দেন বকগুলো ছেড়ে না দিলে তাদের নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করা হবে। নিরূপায় হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বকগুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় শিকারিরা।

দুটি বস্তার মুখ খুলে শিকারিরা বকগুলো ছেড়ে দেয় মুক্ত আকাশে। মুক্তি পেয়ে বকগুলো পাখা ঝাপটে উড়ে যেতে থাকে ধানক্ষেতের দিকে। সে কি নয়নাভিরাম দৃশ্য! খুশিতে ভরে ওঠে অরিকের মন। সবগুলো বক উড়ে যাওয়ার পর মামা ভ্যান গাড়িতে থাকা বাঁশের বানা ভেঙে ফেলেন। শিকারিরা বাকরুদ্ধ হয়ে তাকান বড়ো মামার দিকে। বড়ো মামা চকচকে দুটি পাঁচশ টাকার নোট ধরিয়ে দিলেন তাদের হাতে। বললেন, তোমাদের বকগুলো ছেড়ে দিলাম। বাড়িতে তোমাদের খাবারের জোগাড় নাও থাকতে পারে। এগুলো দিয়ে চাল-ডাল কিনে বাড়ি নিয়ে যাও। এখন থেকে এমন অপরাধমূলক কাজ আর করো না। টাকা পকেটে ভরে তারা ভ্যান গাড়িতে উঠেও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বড়ো মামার দিকে। এরপর দ্রুত চলে যেতে থাকে। বড়ো মামা মনের আনন্দে আবৃত্তি করতে থাকেন,

> বকগুলো উড়ে গেল হলুদাভ ধানক্ষেতের দিকে
> শিকারিরা করুণ দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে
> শিকারির হাত ধরে বলি ভাই দেখো মুক্তির সুখ
> বেঁচে ফেরা বিহঙ্গ ধানক্ষেতে লুকায় মুখ। ❑

সহকারী অধ্যাপক, মির্জাপুর ডিগ্রী কলেজ, চাটমোহর, পাবনা

শিশির কেন পড়ে

আতিক রহমান

হেমন্তে দেখা যায় ঝকঝকে অখণ্ড নীল আকাশ। মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। কী দিন কী রাত বৃষ্টির দেখা মেলে কালেভদ্রে। হেমন্ত শরৎ থেকে খুব পৃথক নয়, শীত থেকেও তেমন বিচ্ছিন্ন নয় তার প্রকৃতি, শীত-শরতের মাখামাখি একটি স্নিগ্ধ সুন্দর বাংলা ঋতু। এমন দিনে যদি ভোরে ঘুম থেকে উঠেন তাহলে দেখবেন ঘাসের ডগায়, ফুলের ওপর, পাতার ওপর বিন্দু বিন্দু পানির কণা জমে আছে। এই পানির কণাকে আমরা বলি শিশির। হেমন্তের শিশির ভেজা ঘাসের ডগা যেন মুক্তার মেলা। প্রশ্ন হলো, এই শিশির কণা আসে কোত্থেকে? ভেবে দেখেছো কখনো বন্ধুরা?

শিশির হলো কোনো শীতল বস্তুর উপর জলীয় বাষ্প জমা হয়ে সৃষ্ট বিন্দু। সহজ করে বললে, রাতের বেলা যখন তাপমাত্রা কমে যায়, তখন বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প ঘাস, গাছের পাতা বা অন্য কোনো ঠান্ডা পৃষ্ঠের উপর জমে ছোটো ছোটো পানির ফোঁটা হয়ে যায়, এটাই শিশির। ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় শিশির। যেখানে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে তরল পদার্থে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া রাতের শীতল তাপমাত্রায় ঘটে থাকে, যখন ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কমে যায়। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাতাস একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে। দিনের বেলায় সূর্যের তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়। এতে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যায়। সাধারণত সন্ধ্যার পরে তাপমাত্রা কমে যায় এবং বাতাস জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। যদি তাপমাত্রা আরো কমে যায়, তখন বাতাস আর জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারে না তা শীতল বস্তুর উপর পানির কণা হিসেবে জমা হয়। এ পানির বিন্দু শিশির বিন্দু নামে পরিচিত। অনেক সময় আমরা ফ্রিজ থেকে বের করা ঠান্ডা পানির বোতলে বিন্দু বিন্দু পানির কণা দেখতে পাই। যেখানে বাতাসের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পানির কণা তৈরি করে। এটাও এক ধরনের শিশির।

শিশির তৈরি অনেকটা তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠের অবস্থান, আবহাওয়া এবং দিনের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। যেমন- শুষ্ক অঞ্চলের চেয়ে আর্দ্র অঞ্চলে এবং ক্রান্তীয় বা উপকূলীয় এলাকায় শিশিরের ঘটনা বেশি দেখা যায়। তবে অতিরিক্ত ঠান্ডা পরিবেশে শিশির তৈরি হয় না। কারণ তাপমাত্রা যদি শূন্য ডিগ্রির নিচে নেমে যায়, তবে জলীয় বাষ্প সরাসরি বরফে পরিণত হয়ে যায়, যা সাবলিমেশন নামে পরিচিত। শীতল আবহাওয়া এবং ভূপৃষ্ঠের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঞ্চলে শিশিরের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ বা ঝড়ের কারণেও শিশির

তৈরির পরিমাণ কমে যায়। বাতাসে যত বেশি আর্দ্রতা থাকবে, তত বেশি শিশির পড়বে। শিশির সবচেয়ে বেশি পড়ে রাতে।

আমরা দেখি শিশির সবসময় গোলাকার। পৃষ্ঠটানের জন্য স্বল্প আয়তনের তরল পদার্থ সবসময় গোলকের আকৃতি গ্রহণ করার চেষ্টা করে। তরলের মুক্ততল স্থিতিস্থাপক পর্দার ন্যায় কাজ করে এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সংকুচিত হয়ে থাকতে চায়। এজন্য তরল পদার্থ গোলকের আকৃতি নেয়, কারণ গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন হয়ে থাকে।

শিশির জলচক্রের একটি অংশ উদ্ভিদের জন্য পানির একটি উৎস হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। শিশিরের পরিমাপ করার জন্য ড্রোজোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

আবহমানকাল থেকে কমনীয়তার প্রতীক শিশিরের নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। সে সৌন্দর্য স্পষ্ট উজ্জ্বলতায় রাঙা, আমাদেরকে তা বিমুগ্ধ করে। হেমন্তর রাতে শিশির পড়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠলে দেখা যায় ঘাসের ডগায় জমে আছে। সূর্যালোক যখন শিশির বিন্দুগুলোতে পড়ে, তখন প্রতিটি শিশির কণা যেন সোনার মতো জ্বল জ্বল করতে থাকে। এ রূপ বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক নিদর্শন। শিশির ভেজা ঘাসে ভোর বেলায় খালি পায়ে হাঁটার অনুভূতিই ভালো লাগার। সাথে রয়েছে অনেক উপকারিতা-

- ভোরবেলা খালি পায়ে ঘাসে হাঁটলে মন খুব শান্ত থাকে
- হাঁটার মাধ্যমে ফ্রেশ অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারি
- সূর্যের আলো দেহে ভিটামিন ডি যোগায়
- চোখের জন্যও ঘাসের সবুজ রং উপকারি
- ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে
- পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পেশি মজবুত হয়
- হাঁটু ও পিঠের ব্যথা দূর করে।

প্রতিদিন শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটলে। শরীর-মন দুই-ই ভালো থাকবে। ভোরবেলা খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর হাঁটাকে এখন বলা হচ্ছে এক অন্যরকম ন্যাচারাল থে রাপি। করোনাকালের দুঃসময়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে এ ন্যাচারাল থেরাপির ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী আগ্রহ বেড়েছে বহুগুণে। এখন খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসে হাঁটাকে 'ডিউ ওয়াকিং' নামে অভিহিত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে এটি এক ধরনের হাইড্রোথে-রাপি। নিজেকে ভালো রাখতে এমন ছোট্ট অভ্যাসগুলোই হয়ে উঠতে পারে জীবনের বড়ো পরিবর্তনের সূচনা।

প্রকৃতিতে নিস্তব্ধতা নিয়ে রাত্রি নেমে এলে শিশিরেরা ফিরে আসে শীত অনুভূতিকে নিয়ে। যুগ-যুগান্তরের এই প্রাকৃতিক সেতুবন্ধন কিছুতেই যেন ছিন্ন হওয়ার নয়। দিনের রৌদ্রতাপ তীব্রতা ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশিরগুলো মুছে যায় প্রকৃতি থেকে। ❑

প্রাবন্ধিক

প্রথম রেলওয়ে স্টেশন

যে স্টেশন জুড়ে থাকত মানুষের ব্যস্ততা, জ্বলেছে চকচকে আলো, সেখানে এখন ভূতুড়ে পরিবেশ। বাংলাদেশের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন কুষ্টিয়ার জগতি। প্রতিদিন স্টেশনটির বুক চিরে দ্রুতগতিতে ট্রেন ছুটে যায় ঠিকই, তবে এই স্টেশনে নেই কোনো ট্রেনের গন্তব্য। ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ আমলে তৈরি ১৬৩ বছর বয়সি রেল স্টেশনটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ রেলস্টেশনে দুটি লোকাল ট্রেন ছাড়া আর কোনো ট্রেন থামে না।

বাংলাদেশে রেলওয়ের কার্যক্রম শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে। ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম রেলগাড়ি চলেছিল। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির তৈরি সেই সময়ে ব্রডগেজ রেলপথ ধরে রানাঘাট থেকে দর্শনা হয়ে একটি ট্রেন এসে থেমেছিল কুষ্টিয়ার এই জগতি রেলস্টেশনে। এটি কুষ্টিয়া শহর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন রেল কোম্পানি ভারতবর্ষে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কাজের জন্য রেলপথ চালু করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এ অঞ্চল বেশ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে এই জগতিতে রেলপথ ও স্টেশন নির্মিত হয়। পরবর্তীতে এখানে 'কুষ্টিয়া চিনিকল' প্রতিষ্ঠিত হলে আখ সরবরাহ ও অর্থনৈতিক কাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই রেলস্টেশন। লাল ইট দিয়ে নির্মাণ করেছিল দোতলা স্টেশন ভবন। স্টিম ইঞ্জিনে পানি দেওয়ার জন্য প্লাটফর্মের দুই পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল বড়ো দুটি ওভারহেড পানির ট্যাংক, সেগুলোও অনেকদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এই ট্যাংক দুটিতে সেই সময় কয়লার ইঞ্জিনে চলা পাম্প দিয়ে মাটির নিচে থেকে পানি তোলা হতো।

১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল পেনিনসুলার রেলওয়ে নামক কোম্পানির নির্মিত প্রথম যাত্রীবাহী বাষ্পচালিত ট্রেন ইঞ্জিন ভারতীয় উপমহাদেশে যাত্রা শুরু করে। মুম্বাইয়ের বোরিবন্দর থেকে থানে পর্যন্ত ৩৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় ৪০০ জন যাত্রী নিয়ে। এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার রেলপথ চালু করার মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রথম রেলপথের সূচনা হয়। এরপর ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ১৮৬২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতার শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত ব্রডগেজ (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) রেলপথ চালু করে। শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট পর্যন্ত যে রেলপথ চালু করা হয়েছিল, সেটাকে সেই বছরেই বর্ধিত করে বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার (সাবেক নদীয়া) জগতি পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার দীর্ঘ করা হয়। তারপর ১৮৬২ সালের ১৫ই নভেম্বর কলকাতার শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়ার জগতি পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এবং পোড়াদহ জংশন স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে এই স্টেশন। এটি বাংলাদেশের প্রথম রেল স্টেশন হওয়ায় ঐতিহাসিক স্টেশন হিসেবে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

অতিথি পাখি রহস্য

কাকলী মজুমদার

শীতকালে আমাদের দেশের হাওড়, বিল, জলাশয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায় রং বে-রঙেয়ের পাখি। এদের আমরা আদর করে বলি 'অতিথি পাখি'। নাম অতিথি হলেও এই পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদের দেশে হাজির হয় নিজেদের জীবন বাঁচাতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা মুখরিত হয়ে ওঠে পাখির কলকাকলিতে। ঢাকার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক ও জলাশয়, নিলফামারী জেলার নীলসাগর দিঘি, দেশের সর্ববৃহৎ হাওড় হাকালুকি ও বৃহত্তর সিলেটের বাইক্কা বিলসহ দেশের বিভিন্ন জলাশয় হাজারো পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়। শীত মওসুমে এদেশে আসা পাখিদের মধ্যে রয়েছে- নানা রং আর কণ্ঠ বৈচিত্র্যের পাখি। যেমন: গোলাপি রাজহাঁস, বালি হাঁস, লেঞ্জা, চিতি, সরালি, পাতিহাঁস, বুটিহাঁস, বৈকাল, নীলশীর পিয়াং, চীনা, পান্তামুখি, রাঙামুড়ি, কালোহাঁস, রাজহাঁস, পেড়িভুতি, চখাচখি, গিরিয়া, খঞ্জনা, পাতারি, জলপিপি, পানি মুরগি, নর্থ গিরিয়া, পাতিবাটান, কমনচিল, কটনচিল প্রভৃতি। এছাড়া গ্রীষ্মকালে সুমেরুতে বাস করে এবং বাচ্চা দেয় হাঁস জাতীয় এমন পাখি শীতকালে বাংলাদেশে আসে। লাল বুকের ক্লাইক্যাসার পাখি আসে ইউরোপ থেকে। আর অন্য সব পাখিরা আসে পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে। এসব পাখিদের মধ্যে বাংলাদেশের অতি পরিচিত অতিথি পাখি নর্দান পিনটেইল। এছাড়া স্বচ্ছ পানির খয়রা চকাচখি, কার্লিউ, বুনো হাঁস, ছোটো সারস পাখি, বড়ো সারস পাখি, হেরন, নিশাচর হেরন, ডুবুরি পাখি, কাদাখোঁচা, গায়ক রেন পাখি, রাজসরালি, পাতিকুট, গ্যাডওয়াল, পিনটেইল, নরদাম সুবেলার, কমন পোচার্ড, বিলুপ্ত প্রায় প্যালাস ফিস ঈগল (বুলুয়া) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মূলত বর্ষার শেষে এবং শীতের আগে থেকেই এসব পাখি বাংলাদেশে আসা শুরু করে এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় মার্চ মাসের শেষ নাগাদ থাকার পর আবার ফিরে যায় পাখিগুলো। পৃথিবীতে প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখি রয়েছে। এদের প্রায় পাঁচ ভাগ হলো পরিযায়ী পাখি। ইংরেজিতে যাদের নাম হলো মাইগ্রেটরি বার্ডস। শীতপ্রধান দেশের এসব পাখিরা শীতকালে তাদের নিজ বাসভূমি ছেড়ে উড়ে চলে যায়

হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে নাতিশীতোষ্ণ কোনো অঞ্চলে। সেখানে শীতকালটা কাটিয়ে দেয়। তারপর শীতের শেষে আবার উড়ে যায় নিজের দেশে। এভাবে বছরের পর বছর পরিযায়ী পাখিরা উড়ে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ চিনে উড়ে বেড়াতে তাদের কোনোই অসুবিধা হয় না।

পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিযায়ী পাখি শুধু এ অঞ্চলেই আসে তা নয় বরং নানা পরিস্থিতিতে পাখি বিশ্বের নানা অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে যা মূলত তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রামেরই অংশ। মূলত বাংলাদেশে শীতের সময়ে জলাশয়গুলোতে পানি কমে যায় এবং সে সময়কার কচিপাতা, শামুক, ঝিনুকসহ কিছু উপাদান এসব পাখির প্রিয় খাবার। সে কারণে ওই সময়ে বাংলাদেশের জলাশয়গুলো হয়ে ওঠে তাদের খাবারের উপযোগী স্থান। ফলে পাখিগুলো যেখান থেকে আসে সেখানে শীতে বরফে সব ঢেকে যাবে এবং খাদ্য সংকট তৈরি হবে। সে কারণেই বেঁচে থাকার উপযোগী স্থান খুঁজতে খুঁজতে কিছু পাখি এ অঞ্চলে আসে। বাংলাদেশের শীতকে উপযোগী জেনে প্রতি বছরই শীতপ্রধান অঞ্চলগুলো থেকে আসে লাখো পরিযায়ী পাখি। এই পাখিরা বাংলাদেশের প্রকৃতিতে ঠাঁই নেয়, প্রিয় অতিথি হয়ে থাকে গোটা শীতের মৌসুম।

পরিযায়ী পাখিদের এই দীর্ঘ যাত্রার ব্যাপারটি যুগে যুগে মানুষকে করেছে বিস্মিত। মানুষের কাছে রয়েছে কম্পাস, জিপিএস, জায়রোস্কোপ ইত্যাদি অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি। এগুলো দিয়ে মানুষ সহজেই দীর্ঘ যাত্রাপথে নির্ভুলভাবে বিমান অথবা জাহাজ পরিচালনা করতে পারে। কিন্তু পাখিদের কাছে কী এমন যন্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে নির্ভুলভাবে তারাও তাদের যাত্রাপথ নির্ধারণ করে? , তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক বছর ধরেই গবেষণা করছেন।সম্প্রতি তারা গবেষণা করে যেসব তথ্য পেয়েছেন, সেটা সত্যিই বিস্ময়কর।

ঘরে বন্ধ করে শুধু একটি ক্ষীণ আলোক রশ্মি দিয়ে গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, বদ্ধ ঘরে পরিযায়ী পাখি সব সময় একটি নির্দিষ্ট দিকেই ওড়ার চেষ্টা করে। দেখে মনে হয়, কোনো এক অদৃশ্য শক্তি বাইরে থেকে পাখিটিকে ক্রমাগত দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই অদৃশ্য শক্তিটি হলো পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র।আর পাখিদের চোখে ক্রিপটোক্রোম (Cryptochrome) নামে এক বিশেষ ধরনের আলোক সংবেদনশীল প্রোটিন অণু রয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ক্রিপটোক্রোমের ইলেকট্রনের এই কোয়ান্টাম পরিবর্তন পাখির চোখে আলোক রশ্মির পরিবর্তন হিসেবে ধরা পড়ে। এর ফলে পাখি যখন উড়ে যায়, তখন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সামান্যতম পরিবর্তনও তার চোখে আলোক রশ্মির সূক্ষ্ম পরিবর্তন হিসেবে ধরা পড়ে।, এই পরিবর্তনের প্যাটার্ন অনুসরণ করেই পরিযায়ী পাখিরা দীর্ঘ যাত্রায় তাদের পথের সন্ধান পায়।

তবে এসব অতিথি পাখিরা শুধু বাংলাদেশে নয়, সারাবিশ্বেই প্রতিবছর ভ্রমণ করে। কথায় আছে পাখিদের আকাশে কোনো সীমান্তরেখা নেই। তারা অনায়াসে উড়ে বেড়ায় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে শীতের মৌসুমে বনভোজন, শখ মেটাতে বা স্পোর্টস হিসেবে অনেকেই পাখি শিকার করেন। একটা পাখিকে হত্যা করা যে অন্যায়, সেই শিক্ষা আমাদের নতুন প্রজন্মকে দিতে হবে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইনের ২৬ ধারামতে পাখি শিকার ও হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। পাখিকে বলা হয় প্রকৃতির অলঙ্কার। পাখি পোকামাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে। পাখির বিষ্ঠা থেকে ফসলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। মোটকথা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে পাখির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আসুন, আমরা সবাই পাখির বন্ধু হই। পরিযায়ী পাখির আগমনকে স্বাগত জানাই, দেখভাল করি। যেন আগামী শীতে ওরা আবার ফিরে আসতে পারে আমাদের দেশে।

হাঁটলে কমবে বিষণ্নতা

হাঁটা এমন এক ব্যায়াম যা কেবল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া নয় বরং শারীরিক সুস্থতা, মুটিয়ে যাওয়া থেকে মুক্তি, ডায়অবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও ভালো ঘুমের সাথে ঘুমের সহায়ক সম্পর্ক রয়েছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁটলে মেজাজ ভালো থাকে। হাঁটলে এনডোরফিনসহ নানা ধরনের মুখের হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়। যা আমাদের মন মেজাজ ভালো করে। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে প্রতিদিন যারা কমপক্ষে ৭ হাজার ৫০০ কদম হাঁটেন, তাদের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণগুলো ৪২ শতাংশ কম থাকে। এছাড়া নিয়ম করে হাঁটলে হতাশাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমে।

হাঁটার সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে এরজন্য কোনো টাকার প্রয়োজন হয় না। লাগে না কোনো যন্ত্রপাতি, বিশেষ সরঞ্জাম। যেতে হয় না কোনো ব্যায়ামাগারের সদস্য। যে কেউ যখন খুশি হাঁটতে পারে। তবে কোথায় হাঁটছেন, কোন পরিবেশে হাঁটছেন,কতটা হাঁটছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির সংস্পর্শ মন ও মেজাজ ভালো করতে বেশি সাহায্য করে। তাই সবুজের সান্নিধ্যে, পার্কে, নদী বা সমুদ্রের ধারে হাঁটলে সবচেয়ে ভালো।

হাঁটার জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে বিকেল। তবে যে-কোনো সময়ই হাঁটা যেতে পারে। প্রথমে ছোটো লক্ষ্য নিয়ে হাঁটা শুরু করা ভালো। যেমন দিনে ১ থেকে ২ হাজার কদম। যখন মনে হবে আপনি প্রস্তুত, তখন ৫০০ কদম করে বাড়াবেন। হাঁটার পরিমাণ বাড়াতে কিছু কাজ করা যেতে পারে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠা। দোকান থেকে দূরে গাড়ি পার্কিং করা ও বাজারে হেঁটে যাওয়ার মতো কাজও করা যেতে পারে।

হাঁটা মানুষের মেজাজ উন্নত করতে পারে। যাদের বিষণ্নতা রয়েছে, তারা অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট ও সাইকোথেরাপির সঙ্গে হাঁটার চর্চা করলে ভালো ফল পেতে পারেন।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন শম্পা

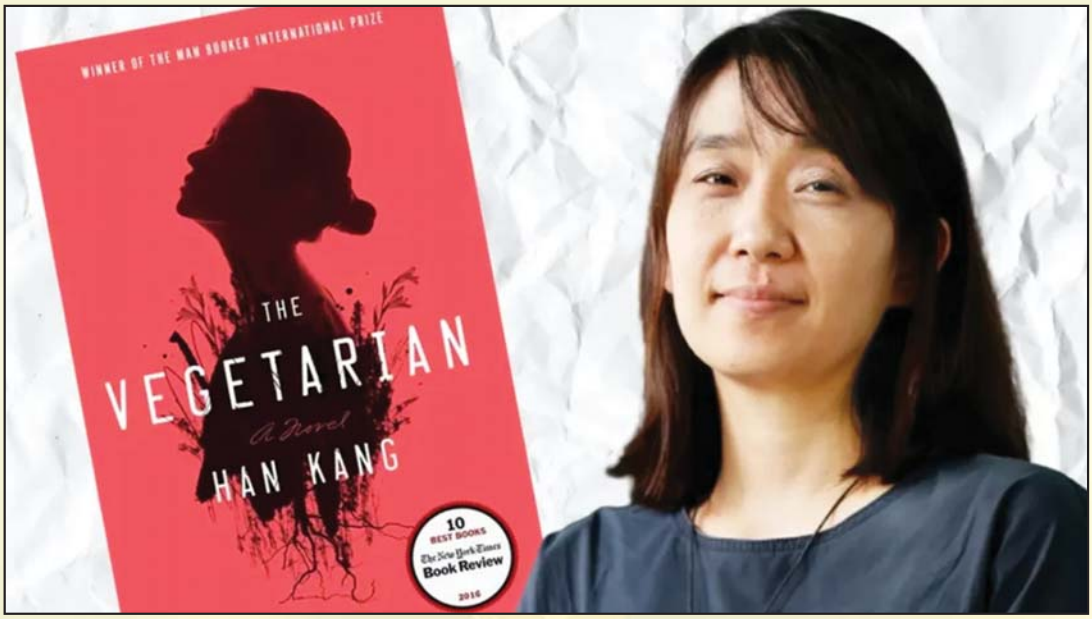

দ্য ভেজিটেরিয়ান জয় করল নোবেল

সাহিত্যে নোবেল জয়ের পর গত এক সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান ক্যাংয়ের বিভিন্ন বই বিক্রি হয়েছে ১০ লাখ ৬ হাজার কপি। দেশটির বইয়ের দোকান ও প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে এএফপি। ৫৩ বছর বয়সি হান কাং প্রথম এশীয় নারী লেখক হিসেবে এ বছর অক্টোবরে নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন।

ছোটো গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হান কাং তার নিজের লেখা বেস্ট সেলার উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান'-এর জন্য নোবেল পেয়েছেন। মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট কাব্যিকভাবে রূপ দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে হান কাংকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়। তিনি নোবেল জেতার পর দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশ সাড়া পড়ে যায়। এর আগে ২০১৬ সালে সাহিত্যের দ্বিতীয় বৈশ্বিক মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার ম্যান বুকারও পেয়েছিলেন তিনি এ উপন্যাসটির জন্য । 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' হানের প্রথম উপন্যাস, যেটি ইংরেজিসহ ৩০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

নোবেল জয়ী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকে ই-বুকসহ হানের বইগুলো ১০ লাখ ছয় হাজার কপি বিক্রি হয়েছে।

কিয়োবোর মুখপাত্র কিম হিউন-জাং জানান, 'হান কাংয়ের বইগুলো অভাবনীয় গতিতে বিক্রি হচ্ছে। এর আগে এমন পরিস্থিতি কখনো হয়নি।'

অনলাইনের বইয়ের দোকান আলাদিনের তথ্য অনুসারে, নোবেল জয়ের পর গত বছরের তুলনায় হানের বইয়ের বিক্রি ১,২০০ শতাংশ বেড়েছে। সেইসঙ্গে অন্যান্য দক্ষিণ কোরীয় লেখকদের বইয়ের বিক্রিও বেড়েছে।

বইয়ের চাহিদা মেটাতে দিনরাত কাজ করছে ছাপাখানাগুলো। কয়েকটি ছাপাখানায় ছুটির দিনগুলোতেও বই ছাপানোর কাজ চলছে।

উল্লেখ্য, তাঁর লেখা উপন্যাস 'দ্য ভেজিটেরিয়ান' ২০১৫ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ডেবোরাহ স্মিথ। এটা তাঁর ইংরেজিতে অনুবাদ করা প্রথম উপন্যাস।

কোরিয়ার প্রধান প্রধান বইয়ের দোকান এবং প্রকাশনা সংস্থাগুলোর ওয়েবসাইটে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ তাঁর বইয়ের জন্য ছুটতে থাকে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

ঋতু অনুযায়ী শিশুর যত্ন

অতিরিক্ত তাপ এবং আর্দ্রতায় বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকে শিশুরা। দক্ষিণ এশিয়ার চারজনের মধ্যে তিনজন শিশু এরই মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ তাপদাহের শিকার। উপরন্তু, দক্ষিণ এশিয়ার ২৮ শতাংশের বেশি শিশু বছরে চার বা তার বেশি তাপদাহের সংস্পর্শে আসে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে শিশুদের অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় বেশি। তাই ঋতু অনুযায়ী শিশুদের যত্নের ধরনও পরিবর্তন করা উচিত। গ্রীষ্মকালে শিশুদের সুস্থ রাখতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

গ্রীষ্মে ঘরোয়া প্রস্তুতি: প্রতিদিনই তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকছে। এ সময়ে বাড়িতে ইমার্জেন্সি কিট রাখা উচিত- যেখানে খাবার স্যালাইন, থার্মোমিটার, পানির বোতল, তোয়ালে, রিচার্জেবল ফ্যানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘর ঠান্ডা রাখা: খোলামেলা ও আরামদায়ক এবং ভালোভাবে বায়ু চলাচলকারী এমন ঘরে শিশুদের রাখা উচিত। দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে পর্দা বন্ধ এবং রাতে জানালা খুলে ঘর ঠান্ডা রাখতে হবে। এ ছাড়া ফ্যান এবং সম্ভব হলে কুলার ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাপ থেকে দূরে রাখা: দিনের গরম সময়ে শিশুদের বাইরে না নেওয়াই ভালো। বাইরে থাকাকালীন, মেডিকেটেড সানস্ক্রিন ব্যবহার এবং ছায়ায় থাকার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে টুপি বা ছাতা ব্যবহার করা যায়। তাপদাহে সুতি কাপড় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে চুবিয়ে দিনে ২-৩ বার শিশুর শরীর মুছে দিতে হবে।

শিশুদের হাইড্রেটেড রাখা: ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের ঘনঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। ৬ মাসের বেশি বয়সী শিশুদের দুই তিন ঘণ্টা পরপর পানি পান করানো উচিত। গোসলের পর, শিশুর মাথা ভালোভাবে শুকাতে হবে, ভেজা চুলের কারণে শিশুর ঠান্ডা লাগতে পারে, এ থেকে জ্বর বা কাশি হতে পারে।

পানিশূন্যতা : পানিশূন্যতা দেখা দিলে শিশুকে কিছু সময় পরপর বিশুদ্ধ পানি, তাজা মৌসুমি ফলের রস বা তরল খাবার দিতে হবে। ফ্রিজের ঠান্ডা পানি না দিয়ে ফলের রস অথবা ডাবের পানি দেওয়া যেতে পারে ।

গরমে মোটা পোশাক পরলে অতিরিক্ত ঘাম থেকে পানিশূন্যতা হতে পারে। তাই হালকা ঢিলেঢালা সুতি কাপড়ের পোশাক পরাতে হবে। বড়ো শিশুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে, তারা সাধারণত তৃষ্ণা নিবারণে রাস্তার পাশের আইসক্রিম বা জুস পান করে, যা ডায়রিয়া বা টাইফয়েডের প্রধান কারণ।

সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা: এ সময় ভাইরাল জ্বরের আশঙ্কা থাকে। শরীরে হাইড্রেশন বজায় রাখতে পর্যাপ্ত তরল পান করা উচিত। ভাইরাস সংক্রমণে কাশি-সর্দি বা নিউমোনিয়া হতে পারে। কাশি হলে লেবুর রস, তুলসী পাতার রস এবং আদা দিয়ে চা খাওয়ানো যেতে পারে। ঘরোয়া চিকিৎসার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে।ঋতু অনুসারে শিশুদের যত্নের ধরনও পরিবর্তন করা উচিত। ছোট্ট বন্ধুরা, সবশেষে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

স্থাপত্যশৈলীতে আন্তর্জাতিক পুরস্কার

পরিবেশবান্ধব ঘর ও আবহাওয়ার গতানুগতিকতায় খোলামেলা পরিবেশসহ ব্যতিক্রমী পাঠদান রয়েছে বিদ্যালয়টিতে। যা প্রান্তিক শিশুদের করেছে স্কুলমুখী। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার নজরকাড়া স্থাপত্যশৈলীতে সাড়া ফেলেছে পাবনার চাটমোহরের শিশুদের স্কুল বড়াল বিদ্যানিকেতন। নান্দনিকতা ও বুদ্ধিদীপ্ত স্থাপত্য নকশার জন্য সম্প্রতি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টসের দুটি পুরস্কার জিতেছে প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্কুলটি।

ইট, পাথর, ইস্পাতের পাশাপাশি এই স্কুলে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ, কাঠ ও মাটি। শিক্ষার্থীরা যেন প্রকৃতির সাথে বেড়ে উঠতে পারে, তার জন্য চারপাশে রাখা হয়েছে সবুজ আর ছায়াময় পরিবেশ। শিশুরা ব্যাগ কাঁধে স্কুলে যায়। স্কুলে প্রবেশের পর ব্যাগ রেখে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শপথ শেষে কিছু শারীরিক কসরত করে শ্রেণিকক্ষে ফিরে সুরে সুরে পড়া শুরু হয় শিক্ষার্থীদের। স্কুলের ভবনটি আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের মিলনস্থল। একতলা দুটি ভবন ও মাঝখানে একটি দ্বিতল ভবন। একতলা ভবনগুলোর ওপর মাটির টালি, জানালা নেই কিন্তু আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সামনের ইটের গাঁথুনি এমনভাবে করা হয়েছে যে ফাঁকা অংশ দিয়ে আলো প্রবেশ করে। দ্বিতল ভবনের নিচতলাটি পুরো খোলা। নেই জানালা বা দরজা। বাঁশের চাটাইয়ে রয়েছে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ছবি। মাঝখানে আছে একটি মাটির তৈরি শীতল পাঠাগার, যেখানে বই সাজানো। ভবনের দুই পাশে সিঁড়ি, যার একদিক দিয়ে উঠা যায়, অন্য দিক দিয়ে নামা যায়। দোতলায় পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। দরজা দিয়ে কক্ষে ঢোকা হয় এবং বিপরীত দিকে স্লাইড, যা প্রয়োজনে পুরোটা খোলা যায়। ভবনের সামনে রয়েছে আম, লিচু, কাঁঠালসহ বিভিন্ন ফলের বাগান। শিক্ষাব্যবস্থাতেও রয়েছে বৈচিত্র্যতা। পড়াশোনার পাশাপাশি শেখানো হয় নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা ও বিতর্ক। আছে কম্পিউটার ল্যাব। শিক্ষকরা জানান, শিক্ষার্থীরা যেন আনন্দ নিয়ে শিখতে পারে সেটিই তাঁদের লক্ষ্য। একজন ছাত্রী জানায়, এখানে কেউ কাউকে বকাঝকা করে না বরং ভুল করলে শিক্ষকেরা হাসিমুখে বুঝিয়ে দেন।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে। প্রথমে একটি টিনের ঘরে ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ২৮১ জন শিক্ষার্থী আছে, শিক্ষক আছেন ১৭ জন। শিক্ষার্থীদের খরচের বেশির ভাগ বহন করেন স্থাপত্যবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'ভিত্তি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইকবাল হাবিব ও তার পরিবার। ইকবাল হাবিব এক সফরে স্কুলটি পরিদর্শন করে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেন। তার নকশায় তৈরি ভবনটি পরিবেশবান্ধব ও খোলামেলা। এখানে বৃষ্টি পড়লে শিক্ষার্থীরা তা উপভোগ করতে পারে, আবার রোদও পাওয়া যায়।

বড়াল নদী রক্ষা আন্দোলন চলাকালেই এই বিদ্যালয়ের ধারণা আসে। স্কুল ভবনের প্রথম স্তরের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি দুই স্তর পর্যায়ক্রমে হবে। এই নকশার জন্যই ইকবাল হাবিব আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টসের দুটি পুরস্কার জিতেছেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. হেমন্তের একটি মাস, ৩. হেমন্তকালে অনুষ্ঠিত একটি উৎসব, ৪. মহাকাশে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ, ৫. জাতীয় খেলা, ৭. কুমিল্লা জেলয়া অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান, ৯. প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, ১২. ঢেউ, ১৩. মাটি খোঁড়ার জন্য লোহানির্মিত অস্ত্র

উপর-নিচ: ১. হেমন্ত মাসে ফুটে একটি ফুল, ২. পুকুরে জন্মে এমন উদ্ভিদ, ৩. স্রোতস্বিনী, ৫. গজ, ৬. যে পানিতে অনেকক্ষণ ডুব দিয়ে থাকতে পারে, ৭. বিভোর, ৮. গোলাপি রঙের এক প্রকার ডাল, ১০. অবস্থা, ১১. স্রোতহীন জলাভূমি

১.		২.	■	৩.			■
	■		■		■	■	■
৪.				■	■	■	■
■	■		■	৫.		৬.	■
৭.			৮.		■		■
	■	■		■	■		■
	■	■	৯.		১০.	■	১১.
১২.			■	■	১৩.		

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	-		+	২	=	
*	■	/	■	+	■	+
	*	২	+		=	৬
-	■	+	■	*	■	+
৫	-		*	১	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৫	+		=	১৩

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: ছিদ্রানুসন্ধানী, রিপু, টব, পূর্বানুমান, পূর্বপুরুষ, কান, লহর, নীলকুঠি, ষট, বছর, ছয়, কাঠি, নদ

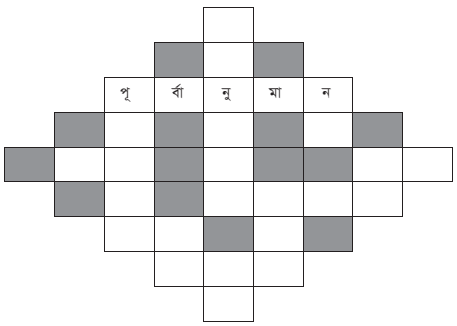

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপর-নিচ আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫৯		৫৭	৫০			৪১		৩৯
	৬১			৫২	৪৭		৪৩	
৬৩	৬২		৫৪		৪৬	৪৫	৪৪	
	৬৫		৬৭	৩২				৩৬
৭৩		৭১			১৪		১২	
	৮১	৭০		৩০		১৬		১০
	৮০		২৮	২৯	১৮		৮	১
	৭৯	২৬		২২		৬		
৭৭			২৪		২০		৪	

অক্টোবর মাসের সমাধান

শব্দধাঁধা

ই	উ	নি	সে	ফ		বা	
য়া		উ		স	ও	গা	ত
কু		জি	রা	ফ		ন	
ত		ল্যা		রা			ঘ
		ন্ড		স	ত্যি	কা	র
ক						র	
ম	রি	চ		ফি		চু	
লা		ঞ্চু		ত	লা	পি	য়া

ছক মিলাও

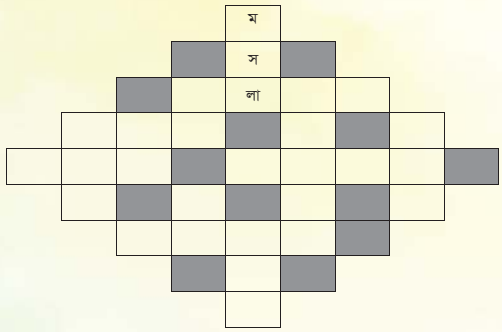

ব্রেইন ইকুয়েশন

৬	*	১	+	২	=	৮
*		+		-		+
২	*	৩	+	১	=	৭
-		*		+		-
৭	*	২	-	৫	=	৯
=		=		=		=
৫	+	৭	-	৬	=	৬

নাম্ব্রিক্স

৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৩৩	৩২	৩১	২৮	২৭
৫০	৫৩	৫৪	৪৫	৩৪	৩৫	৩০	২৯	২৬
৫১	৫২	৫৫	৪৪	৪৩	৩৬	২৩	২৪	২৫
৮০	৭৯	৫৬	৪১	৪২	৩৭	২২	১৯	১৮
৮১	৭৮	৫৭	৪০	৩৯	৩৮	২১	২০	১৭
৭৬	৭৭	৫৮	৫৯	৬০	১৩	১৪	১৫	১৬
৭৫	৭০	৬৯	৬৮	৬১	১২	৭	৬	৫
৭৪	৭১	৬৬	৬৭	৬২	১১	৮	৩	৪
৭৩	৭২	৬৫	৬৪	৬৩	১০	৯	২	১

মো. ইয়াকুব বর্ণ, তৃতীয় শ্রেণি, জুনিয়র এইড স্কুল, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

মো. তাহসিন ইসলাম রুহি, পঞ্চম শ্রেণি, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল

শারিকা তাসনিম, ষষ্ঠ শ্রেণি, হাজিগঞ্জ গার্লস বালিকা বিদ্যালয়, চাঁদপুর

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-49, No-05. November 2024, Tk-20.00
Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

তামাজুর জামান গল্প, প্রথম শ্রেণি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা